চতুর্থ অধ্যায়
জনসংখ্যা ও জনবিন্যাস

জনসংখ্যা

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের আয়তন ৫৩২৪ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের আয়তনের ৬.০৮ শতাংশ। জেলার মোট জনসংখ্যা ৫৮,৬৩,৭১৭ যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৭.৩১ শতাংশ। মুর্শিদাবাদ রাজ্যের পঞ্চম জনবহুল জেলা।

এই জনসংখ্যার মধ্যে ৩০,০৪,৩৮৫ জন অর্থাৎ ৫১.৪৬ শতাংশ পু(ষ। নারীর সংখ্যা ২৮,৫৯,৩৩২ জন অর্থাৎ ৪৮.৫৪ শতাংশ। অন্যভাবে বললে জেলায় প্রতি এক হাজার জন পু(ষ পিছু ৯৫২ জন নারী বাস করেন। রাজ্যের (ে ত্রে এই সংখ্যাটি ৯৩৪। অর্থাৎ লিঙ্গ-অনুপাতের বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজ্যের তুলনায় অগ্রণী।

মুর্শিদাবাদ একটি গ্রামীণ ও কৃষিপ্রধান জেলা। জেলার মোট ৫৮,৬৩,৭১৭ জন মানুষের মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৫১,৩১,৩৭৪ জন অর্থাৎ জনসংখ্যার ৮৭.৫১ শতাংশ। রাজ্যের (ে ত্রে এই অনুপাত ৭১.৯৭ শতাংশ। প(ান্তরে এ জেলার ৭,৩২,৩৪৩ জন বা জনসংখ্যার ১২.৪৯ শতাংশ মানুষ শহরবাসী। তুলনায় রাজ্যে শহরবাসীর অনুপাত অনেক বেশী, ২৮.০৩ শতাংশ।

২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব যেখানে ৯০৪, মুর্শিদাবাদে জনবসত্তির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১০১ জন।

সা(রতার বিচারে মুর্শিদাবাদ জেলা রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই পশ্চাদপদ। এ রাজ্যে সা(রতার হার যেখানে ৬৯.২২ শতাংশ, জেলায় ঐ হার মাত্র ৫৫.০৬ শতাংশ। নারী সা(রতার হার রাজ্যে ৬০.২২ শতাংশ ও জেলায় ৪৮.৩৩ শতাংশ। পু(ষ সা(রতার হার রাজ্যে ৭৭.৫৮ শতাংশ ও জেলায় ৬১.৪০ শতাংশ। আশার কথা গত এক দশকে সা(রতার হার বৃদ্ধিতে রাজ্যে এ জেলার স্থান চতুর্থ।

জেলার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৪.১৪ শতাংশ অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুত্ত(বা উপার্জনকারী। রাজ্যে এই অনুপাত ৩৬.৭৮ । জেলার মোট কর্মী জনসংখ্যার মধ্যে কৃষির সঙ্গে যুত্ত(কর্মীর অনুপাত (পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি সহ) ৪৬.৪৭ শতাংশ। এর মধ্যে কৃষিজীবির অনুপাত ১৮.৪৮ শতাংশ ও কৃষিশ্রমিকের অনুপাত ২৭.৯৯ শতাংশ। রাজ্যের (ে ত্রে মোট কর্মী জনসংখ্যা ও কৃষির সাথে যুত্ত(কর্মীর অনুপাত ৪৩.৯৫ শতাংশ।

জেলার জনসংখ্যার ১৩.৪ শতাংশ হল তপসিলী জাতিভুত্ত(। উপজাতীয় মানুষের অনুপাত ১.৩ শতাংশ (১৯৯১)।

জনসংখ্যার পরিবর্তন ঃ

প্রাক-জনগণনা পর্বের সমগ্র জেলার জনসংখ্যার তেমন কোনও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ১৮৩৭ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম পূর্বতন দৌলতাবাদ থানার জনগণনা করেছিলেন। তখন ঐ জনসংখ্যা হয়েছিল ৬২,০৩৭। ১৮৬০ সালে রেভিনিউ সার্ভের সময় জে.ই. গ্যাস্ট্রেল-নির্ধারিত জেলার জনসংখ্যা ছিল ১১,০০,০৮০। তার মধ্যে ৭,০৪,৭১৪ জন ছিল হিন্দু। ১৮৭২-এর জনগণনায় জেলার জনসংখ্যা নির্ধারিত করা হয়েছিল ১২,১৪,১০৪, জন। অর্থাৎ ১৮৬০ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে জেলার জনবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩৬ শতাংশ।

জেলার জনসংখ্যার পরিবর্তন আলোচনার আগে জেলার মৃত্তিকা, জলনিকাশি ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধানের বন্দোবস্ত ইত্যাদি সম্পর্কে এবং জনস্বাস্থ্যের উপর তাদের প্রভাব সম্পর্কে সং(েপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে দশম অধ্যায়ে।

জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে জেলাকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় - স্বাস্থ্যকর অঞ্চল ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল। ভাগীরথীর পশ্চিমদিকটি হল স্বাস্থ্যকর অঞ্চল।

ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত জেলার রাঢ় অঞ্চল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঢালু। ভাগীরথীর উপনদীগুলি এই অঞ্চলের উপর দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বাহিত হয়ে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়। ল্যাটেরাইট এবং তার উপর পলির স্তর - এই হল এই অঞ্চলের মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য। বেঙ্গল ড্রেনেজ কমিটির (১৯০৬-০৭) মতে এ অঞ্চলটি জেলার স্বাস্থ্যকর অঞ্চল।

জেলার অস্বাস্থ্যকর অঞ্চল হল ভাগীরথীর পূর্বভাগ, অর্থাৎ

প্রায় সমগ্র বাগড়ী এলাকা। গোবরানালা, শিয়ালমারী, ভৈরব ও জলঙ্গীর পরিত্যক্ত খাত এই এলাকায় অসংখ্য বদ্ধ জলা ও জলাভূমি তৈরী করেছে। গোবরানালা, শিয়ালমারী ও ভৈরব বছরের বেশীর ভাগ সময় থাকে গতিহীন আর বর্ষাকালে তারা হয় মন্থরগতি। সমগ্র বাগড়ী এলাকার নবসঞ্চিত পলি বছরে অন্তত ছয়মাস থাকে ভিজে, স্যাঁৎসেঁতে। সমগ্র অঞ্চলটাই যেন মশার আঁতুরঘর।

বেঙ্গল ড্রেনেজ কমিটির মতে জেলার সবচেয়ে ম্যালেরিয়া-প্রবণ থানা হল ভগবানগোলা (এখনকার লালগোলা ও রাণীনগর থানা-এর মধ্যে পড়ে), জিয়াগঞ্জ, ডোমকল ও জলঙ্গী। এর সবটাই বাগড়ী অঞ্চলের। সব থেকে কম ম্যালেরিয়া-প্রবণ এলাকা হল সমগ্র কান্দী মহকুমা, ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, সুতি , রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানা।

১৮৭২ থেকে ১৮৯১-এর মধ্যে জেলাতে বর্ধমান জ্বর নামে মহামারীর প্রকোপ দেখা দেয়। বাগড়ী অঞ্চলের থেকে রাঢ় অঞ্চলে এই জ্বরের প্রকোপ ছিল বেশী। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অজয়ের উত্তরে রেললাইন সম্প্রসারণের ফলে প্রাকৃতিক জলনিকাশি ব্যবস্থা বাধা পায়। জমা জলে জন্মানো মশার থেকে বর্ধমান জ্বর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আগের বারো বছরে (১৮৬০-৭২) জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.৩৬ শতাংশ। ১৮৭২-১৮৯১, এই ঊনিশ বছরে জেলার জনসংখ্যা মাত্র ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

১৮৯১-১৯০১ দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬.৬ শতাংশ। এই বৃদ্ধি কিন্তু জেলার সব অঞ্চলে সমানভাবে হয়নি। পূর্বদিকের নিচু জলাজমিতে লোকসংখ্যা বেড়েছিল ৩ শতাংশ। ভাগীরথীর পশ্চিমে লোকসংখ্যা বেড়েছিল ১২.৯ শতাংশ। তার মধ্যে নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানাতে জন-বৃদ্ধির হার ছিল ২৬ শতাংশ। নবগ্রাম ও সাগরদীঘির এতটা জনবৃদ্ধির কারণ কেবল স্বাস্থ্যকর জল ও মাটি নয়। সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম থেকে কর্মহীন ভূমিহীন সাঁওতাল শ্রমিকদের অভিবাসন ছিল এর আর একটি বড় কারণ।

১৯০১ সালের সেন্সাসের সময় দেখা যায় ১৮৭২-১৯০১ কালপর্বে জেলায় মোট জনসংখ্যা বেড়েছে ৯ শতাংশ অর্থাৎ বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৩ শতাংশ। জন্মহারের থেকে মৃত্যুহার ছিল সামান্য কম এবং শিশুমৃত্যু, জন্মকালীন মৃত্যু ও ম্যালেরিয়া-জনিত মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্ত বেশী। দরিদ্রতম সাঁওতাল শ্রমিকদের অভিবাসন ছাড়া সামগ্রিকভাবে অভিবাসনের সংখ্যাও নগণ্য ছিল।

১৯০১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত জনসংখ্যার পরিবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯০১--২০০১ সময়কালে জেলা ও রাজ্যের জনসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র দেওয়া হল সারণী ৪.১-এ। একই কালপর্বে জেলা ও মহকুমাগুলির জনসংখ্যার পরিবর্তনের চিত্র দেওয়া হল সারণী ৪.২-তে। এখানে ডোমকল মহকুমা তৈরীর আগের লালবাগ ও সদর মহকুমা ধরা হয়েছে। ভাগ হওয়ার পরে লালবাগ, সদর ও ডোমকল মহকুমার জনসংখ্যা (২০০১) যথাত্র(মে ১০, ৪১২, ১৬(১৪, ৫১, ৪২৩ ও ৮, ৩৭, ৩৯২। জেলার ও তার গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার পরিবর্তনের চিত্র দেওয়া হল সারণী ৪.৩-এ।

শতাব্দীর প্রথম দশকে (১৯০১-১১) জেলার জনসংখ্যা সামান্য বেড়েছে (১.৭১ শতাংশ)। রাজ্যের (৬ শতাংশ) তুলনায় এই বৃদ্ধি অনেকটাই কম। এই দশকে জেলার গ্রামাঞ্চলের (১.২ শতাংশ) তুলনায় শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী (৯.৯৮ শতাংশ)। মহকুমাগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী জঙ্গীপুর (৫.২৬) ও কান্দী (৪.৭১) মহকুমায়। দুটি মহকুমাই রাঢ় এলাকার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম সদর (২.৩৮ শতাংশ) ও লালবাগ (০.৯৬) মহকুমায়। দুটি মহকুমাই বাগড়ী অঞ্চলের।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১১-১৯২১) জেলার জনসংখ্যা ৮.৯৯ শতাংশ হ্রাস পায়। এই দশকে রাজ্যের লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ২.৯১ শতাংশ হারে। জেলার গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা কমলেও শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা কিন্তু এই দশকে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রতিটি মহকুমাতেই এই দশকে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।

প্রথম দশকের জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্বিতীয় দশকের জনসংখ্যা হ্রাসের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় সামগ্রিকভাবে শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। এই দুটি দশকের (১৯০১-২১) বার্ষিক জনসংখ্যা হ্রাসের হার ০.৪০ শতাংশ। এই দুই দশকে ম্যালেরিয়া ও সমজাতীয় জ্বরের কারণে মৃত্যুর বার্ষিক গড় হার ছিল ২.৯৭ শতাংশ। ১৯০৪ সালে বাগড়ী অঞ্চলে বড় আকারে বন্যা হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়। ফসলের (তি হয় এবং জল জমার কারণে রোগের প্রকোপ বাড়ে। ১৯০৫ সালে কলেরা মহামারীতে প্রায় ৮,০০০ লোক মারা যায়। ১৯০৭ সালে গুটিবসন্ত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ শাখা ও ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের বারহাড়োয়া-আজিমগঞ্জ-কাটোয়া শাখার সম্প্রসারণ - এর জন্য বহিরাগত শ্রমিকেরা কাজ করতে এসে জেলায় বসবাস

সারণী- ৪.১

জেলা ও রাজ্যের জনসংখ্যার পরিবর্তন (১৯০১-২০০১)

জনগণনা	জেলা			রাজ্য		
বছর	জনসংখ্যা	পরিবর্তন	পরিবর্তনের শতাংশ	জনসংখ্যা	পরিবর্তন	পরিবর্তনের শতাংশ
১৯০১	১৩,২২,৪৮৬	-	-	-	-	-
১৯১১	১৩,৪৫,০৭৩	(+) ২২,৫৮৭	(+) ১.৭১	-	-	(+) ৬.০০
১৯২১	১২,২৪,১৮১	(-) ১,২০,৮৯২	(-) ৮.৯৯	-	-	(+) ২.৯১
১৯৩১	১৩,৭০,৬৭৭	(+) ১,৪৬,৭৯৬	(+) ১১.৯৭	-	-	(+) ৮.১৪
১৯৪১	১৬,৪০,৫৩০	(+) ২,৬৯,৮৫৩	(+) ১৯.৬৯	-	-	(+) ২২.৯৩
১৯৫১	১৭,১৫,৭৫৯	(+) ৭৫,২২৯	(+) ৪.৫৯	-	-	(+) ১৩.২২
১৯৬১	২২,৯০,০১০	(+) ৫,৭৪,২৫১	(+) ৩৩.৪৭	-	-	(+) ৩২.৮০
১৯৭১	২৯,৪০,২০৪	(+) ৬,৫০,১৯৪	(+) ২৮.৩৯	৪,৪৩,১২,০১১	(+)	(+) ২৬.৮৭
১৯৮১	৩৬,৯৭,৫৫২	(+) ৭,৫৭,৩৪৮	(+) ২৫.৭৫	৫,৪৫,৮০,৬৪৭	(+) ১,০২,৬৮,৬৩৬	(+) ২৩.১৭
১৯৯১	৪৭,৪০,১৪৯	(+) ১০,৪২,৫৯৭	(+) ২৮.২০	৬,৮০,৭৭,৯৬৫	(+) ১,৩৪,৯৭,৩১৮	(+) ২৪.৭৩
২০০১	৫৮,৬৩,৭১৭	(+) ১১,২৩,৫৬৮	(+) ২৩,৭০	৮,০২,২১,১৭১	(+) ১,২১,৪৩,২০৬	(+) ১৭.৮৪

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

সারণী- ৪.৩

জেলার জনসংখ্যার পরিবর্তনের গ্রাম ও শহর ভিত্তিক চিত্র (১৯০১-২০০১)

জনগণনা	জেলা			গ্রাম			শহর		
বছর	জনসংখ্যা	পরিবর্তন	পরিবর্তনের শতাংশ	জনসংখ্যা	পরিবর্তন	পরিবর্তনের শতাংশ	জনসংখ্যা	পরিবর্তন	পরিবর্তনের শতাংশ
১৯০১	১৩,২২,৪৮৬	-	-	১২,৪৬,৫৭৮	-	-	৭৫,৯০৮	-	-
১৯১১	১৩,৪৫,০৭৩	২২,৫৮৭	১.৭১	১২,৬১,৫৯০	১৫,০১২	১.২০	৮৩,৪৮৩	৭.৫৭৫	৯.৯৮
১৯২১	১২,২৪,১৮১	-১,২০,৮৯২	-৮.৯৯	১১,৩৬,২৯৬	-১.২৫,২৯৪	-৯.৯৩	৮৭,৮৮৫	৪,৪০২	৫.২৭
১৯৩১	১৩,৭০,৬৬৭	১,৮৬,৭৯৬	১১.৯৭	১২,৭৮,৮৬৯	১,৪২,৫৭৩	১২.৫৫	৯১,৮০৮	৩.৯২৩	৪.৪৬
১৯৪১	১৬,৪০,৫৩০	২,৬৯,৮৫৩	১৯.৬৯	১৫,২০,০৮১	২,৪১,২১২	১৮.৮৬	১,২০,৪৪৯	২৮,৬৪১	৩১.২০
১৯৫১	১৭,১৫,৫৫৯	৭৫,২২৯	৪.৫৯	১৫,৮০,৮৩২	৬০,৭৫১	৪.০০	১,৩৪,৯২৭	১৪,৪৭৮	১২.০২
১৯৬১	২২,৯০,০১০	৫,৭৪,২৫১	৩৩.৪৭	২৪,৯৪,৫৪৬	৫,১৩,৭১৪	৩২.৫০	১,৯৫,৪৬৪	৬০,৫৩৭	৪৪.৮৭
১৯৭১	২৯,৪০,২০৪	৫,৫০,১৯৪	২৮.৩৯	২৬,৯১,৯৭৯	১,৯৭,২৩৩	২৮,৫১	২,৪৮,৪২৫	৫২,৯৬১	২৭.১০
১৯৮১	৩৬,৯৭,৫৫২	৭,৫৭,৩৪৮	২৫.৭৫	৩৩,৫১,৫৩৪	৬,৫৯,৭৫৫	২৪.২২	৩,৪৬,০১৮	৯৭,৫৯৩	৩৯.২৮
১৯৯১	৪৭,৪০,১৪৯	১০,৮২,৫৯৭	২৮.১৯	৪২,৪৫,৮০২১	৮,৯৪,২৬৮	২৬.৬৮	৪,৯৪,৩৪৭	১,৪৮,৩২৯	৪২.৮৬
২০০১	৫৮,৬৩,৭১৭	১১,২৩,৫৬৮	২৩.৭০	৫১,৩১,৩৭৪	৮,৮৫,৫৭২	২০.৮৬	৭,৩২,৩৪৩	২,৩৭,৯৯৬	৪৮.১৪

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

সারণী - ৪.২

জেলা ও মহকুমাগুলির জনসংখ্যা পরিবর্তনের চিত্র (১৯০১-২০০১)

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
জেলা											
জনসংখ্যা	১৩,২২,৪৮৬	১৩,৪৫,০৭৩	১২,২৪,১৮১	১৩,৭০,৬৭৭	১৬,৪০,৫৩০	১৭,১৫,৭৫৯	২২,৯০,০১০	২৯,৪০,২০৪	৩৬,৯৭,৫৫২	৪৭,৪০,১৪৯	৫৮,৬৩,৭১৭
পরিবর্তন		২২,৫৮৭	-১,২০,৮৯২	১,৪৬,৭৯৬	২,৬৯,৮৫৩	৭৫,২২৯	৫,৭৪,২৫১	৬,৫০,১৯৪	৭,৫৭,৩৪৮	১০,৪২,৫৯৭	১১,২৩,৫৬৭
হার		১.৭১	-৮.৯৯	১১.৯৭	১৯.৬৯	৪.৫৯	৩৩.৪৭	২৮.৩৯	২৫.৭৫	২৮.১৯	২৩.৭০
জঙ্গীপুর											
জনসংখ্যা	৩,১৩,২০৫	৩,২৯,৫০৪	২,৯৩,৩১৪	৩,৪২,৮৯৮	৪,১১,৬৯৮	৪,৩১,৯৭৯	৫,৫৪,২৭৪	৭,৩২,৮৮১	৯,০৩,৮৮৩	১১,৮৮,৬২২	১৫,৩০,৪০৮
পরিবর্তন		১৬,৪৭৯	-৩৬,১৯০	৪৯,৫৮৪	৬৮,৭২০	২০,৩৬১	১,২২,২৯৭	১,৭৮,৬০০	১,৭১,০০২	২,৮৪,৭৩৯	৩,৪১,৭৮৬
হার		৫.২৬	-১০.৯৮	১৬.৯০	২০.০৪	৪.৯৪	২৮.৩১	৩২.২২	২৩.৩৩	৩১.৫০	২৮.৭৫
লালবাগ											
জনসংখ্যা	২,৯১,১৪৫	২,৯৩,৯৪৭	২,৬৮,৯১৭	৩,১০,১৩৫	৩,৬৩,৮৮৫	৩,৯৩,৮৭১	৫,২৮,৬৬৫	৬,৫৯,১৬৯	৮,৪০,৭৩৬	১০,৯৮,৯২২	১৩,৫১,৩৮৭
পরিবর্তন		২,৮০২	-২৫,০৩০	৪১,২১৮	৫৩,৭৫০	২৯,৯৮৬	১,৩৪,৭৯৪	১,৩০,৫০২	১,৮১,৫৬৯	২,৫৮,১৮৬	২,৫২,৪৬৫
হার		০.৯৬	-৮.৫১	১৫.৩২	১৭.৩৩	৮.২৪	৩৪.২২	২৪.৬৮	২৭.৫৪	৩০.৭০	২২.৯৭
বহরমপুর											
জনসংখ্যা	৪,৩০,৩৮৯	৪,২০,১২৯	৩,৮১,১৩৫	৪,০৪,৫০৫	৪,৯৯,৭৪৯	৫,৪৪,২২৮	৭,৪১,২৭৮	৯,৫৭,৮০০	১২,৪৪,৩৮৮	১৫,৯৭,০৩৫	১৯,৭৮,৬৪৪
পরিবর্তন		-১০,২৬০	-৩৮,৯৯৪	২৩,৩৭০	৯৫,২৪৪	৪৪,৪৭৯	১,৯৭,০৫০	২,১৬,৫২২	২,৮৬,৫৮৮	৩,৫২,৬৪৭	৩,৮১,৬০৯
হার		-২.৩৮	-৯.২৪	৬.১৩	২৩.৫৪	৮.৯০	৩৬.২০	২৯.২০	২৯.৯২	২৮.৩৩	২৩.৮৯
কান্দী											
জনসংখ্যা	২,৮৭,৯২৭	৩,০১,৪৯৩	২,৮০,৮১৫	৩,১৩,১৩৯	৩,৬৫,২৭৮	৩,৪৫,৬৮১	৪,৬৫,৭৯১	৫,৯০,৩৫৬	৭,০৮,৬২৫	৮,৫৫,৫৭০	১০,০০,২৭৮
পরিবর্তন		১৩,৫৬৬	-২০,৬৭৮	৩২,৩২৪	৫২,১৩৯	-১৯,৫৯৭	১,২০,১১০	১,২৪,৫৬৫	১,১৮,২৬৯	১,৪৬,৯৪৫	১,৪৭,৭০৮
হার		৪.৭১	-৬.৮৫	১১.৫১	১৬.৬৫	-৫.৩৬	৩৪.৭৪	২৬.৭৮	২০.০৩	২০.৭৩	১৭.২৬

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

মন্তব্য ঃ ডোমকল মহকুমা তৈরী হওয়ার পূর্বের অবিভক্ত(লালবাগ ও বহরমপুর মহকুমা ধরা হয়েছে।

শু(করলেও ১৯১১ সালের জনগণনায় দেখা যায় জেলায় আগত মানুষের তুলনায় কর্মসূত্রে বা কাজের খোঁজে জেলার বাইরে চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৫,০০০ বেশী। ১৯১১-২১ দশকে গোটা রাজ্যের সঙ্গে জেলার লোকসংখ্যাও হ্রাস পায়। প্রথম দুই দশকে জনসংখ্যা হ্রাসের বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ছিল সদর মহকুমায় (০.৬৪ শতাংশ)। কান্দী মহকুমায় বার্ষিক জনসংখ্যা হ্রাসের হার ছিল সর্বনিম্ন (০.১৩ শতাংশ)।

১৯২১-৩১, অর্থাৎ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জেলার জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১১.৯৭) রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (৮.১৪)-কে ছাপিয়ে যায়। জেলার গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১২.৫৫) এই প্রথম জেলার শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (৪.৪৬)-কে অতিত্র(ম করে। মহকুমাগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনবৃদ্ধি হয়েছিল জঙ্গীপুর মহকুমাতে (১৬.৯০ শতাংশ)। সর্বনিম্ন হারে জনবৃদ্ধি হয়েছিল সদর মহকুমায়। অপ্রত্যাশিতভাবে লালবাগ মহকুমায় জনবৃদ্ধির হার ছিল উচ্চ (১৫.৩২)।

এই দশকে জন্মহার বা অভিবাসনের হার খুব একটা না বাড়লেও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছিল। জল-জমা, প্রাকৃতিক জলনিষ্কাষণ ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া, বাগড়ী এলাকার এ জাতীয় সমস্যাগুলোর আংশিক সমাধান হয় পদ্মার ভাঙনের জন্য। ফলে স্বাস্থ্যহানি ও অকালমৃত্যুর মাত্রা হ্রাস পায়। লালগোলা, ভগবানগোলা, রাণীনগর থানার অনেকগুলি জলাভূমি-সংলগ্ন গতিহারা জলপ্রবাহ বর্ষার সময় সচল হয়। ডোমকল, জলঙ্গী থানা এলাকাতেও এই ঘটনা ঘটে এবং পরিবেশ স্বাস্থ্যর(ার অনুকূল হয়ে ওঠে। শেষোক্ত(দুটি এলাকাতে জনাগমও শু(হয়। অন্য এলাকায় গঙ্গা-পদ্মার ভাঙনও এই জনাগমের অন্যতম কারণ। এই দশকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে হরিহরপাড়ায় জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। জিয়াগঞ্জ অঞ্চলের জনসংখ্যাও ৩.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। রেশম শিল্পের অবনতির জন্য এই সময় বহু মানুষ অন্য এলাকায় চলে যায়।

১৯৩১--১৯৪১, অর্থাৎ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৬৯ শতাংশ। এ হার রাজ্যের তুলনায় কম। জেলার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে জনবৃদ্ধির হার ছিল বেশী। প্রতিটি মহকুমাতেই জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। নিঃসন্দেহে এই দশকে স্বাস্থ্য-অবস্থার উন্নতি হয়েছিল।

পরের দশকটিতে (১৯৪১--৫১) জনসংখ্যা বাড়লেও বৃদ্ধির হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল (৪.৫৯ শতাংশ)। বাগড়ী এলাকার লালবাগ ও সদর মহকুমার তুলনায় রাঢ় এলাকাভূক্ত(জঙ্গীপুর মহকুমার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছিল। কান্দী মহকুমার মোট জনসংখ্যা হ্রাস পায় ৫.৩৬ শতাংশ। সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ১৯৪৩ বা ১৩৫০-এর মন্বন্তর। এছাড়া ১৯৪৩--৪৪ এর কলেরা, গুটিবসন্ত ও ম্যালেরিয়া জনিত মহামারী, ১৯৪৬--৪৭-এর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দেশভাগ এবং ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ফলে মুসলিম জনসংখ্যার বহির্গমন ইত্যাদি এই দশকের জনহ্রাসের মূল কারণ ছিল। রাঢ় এলাকা বাগড়ী এলাকার তুলনায় চিরাচরিত ভাবে কৃষিতে পশ্চাদপদ হওয়ায় মন্বন্তরের আঘাত জঙ্গীপুর, বিশেষতঃ কান্দী মহকুমায় প্রবল ছিল। এই দশকে কান্দী মহকুমার প্রতিটি থানাতেই জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

কোনো কোনো জনসংখ্যাতত্ত্ববিদের মতে ১৯৪১-এর জনগণনার তথ্য প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তাঁদের মতে ১৯৪১-এ মুসলিম লীগের প্ররোচনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশ জেলার মুসলিম জনসংখ্যা বাড়িয়ে দেখান। ১৯৫১-তে রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্তন হওয়ায় প্রকৃত সংখ্যাটা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই মতের প্রবক্ত(ারা মনে করেন সঠিক বি(-ষণের স্বার্থে ১৯৫১ সালের জনগণনার সাথে ১৯৩১ সালের জনগণনার তুলনাই বাঞ্ছনীয়।

১৯৩১--৫১-এই দুই দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বার্ষিক ১৬.২০ শতাংশ হারে। এর আগের দশকের (অর্থাৎ ১৯২১-৩১) তুলনায় এই বৃদ্ধির হার বেশী। সদর মহকুমা, যেখানে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে জনবৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৭২। অন্যদিকে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ কান্দী মহকুমাতে জনবৃদ্ধির হার ০.৫২ শতাংশ।

১৯৫১--৬১ জনবিস্ফোরণের দশক। এ দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৩.৪৭ শতাংশ। রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩২.৮ শতাংশ। এ দশকে জেলার গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (৩২.৫০) -এর চেয়ে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (৪৪.৮৭) অনেক বেশী, যা গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিযানের ঈঙ্গিতবাহী। মহকুমাগুলির মধ্যে জনবৃদ্ধির হার সর্বাধিক সদর মহকুমায় (৩৬.২০ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন জঙ্গীপুর মহকুমায় (২৮.৩১ শতাংশ)। জেলার পূর্বদিকের অর্থাৎ বাগড়ী এলাকার থানাগুলির জনবৃদ্ধির হার রাঢ় এলাকার থানাগুলির থেকে বেশী। জেলার সর্বাধিক জনবৃদ্ধি হয়েছিল হরিহরপাড়া থানা এলাকায় (৪৯.২ শতাংশ) এবং তার ঠিক পিছনে ছিল মুর্শিদাবাদ (৪৫.৬) ও জলঙ্গী (৪৪.১) থানা। অন্যদিকে রাঢ় এলাকার মধ্যে

সর্বাধিক জনবৃদ্ধি হয়েছিল সাগরদীঘি থানায় (৪১.১)। কান্দী, খড়গ্রাম, নবগ্রাম-এ বৃদ্ধির হার ছিল মাঝারি মাপের। ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ এসব থানা এলাকার জনবৃদ্ধির হার ছিল নিতান্তই কম।

এই দশকে বি(ে স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ প্রকল্পের রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যালেরিয়া প্রায় দূর হয়ে যায়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, মাতৃমঙ্গল প্রকল্প ইত্যাদির রূপায়ণের জন্য শিশুমৃত্যু ও জন্মকালীন শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পায়। এভাবে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। আগের দশকে মৃত্যুহার ছিল ২৩.৮ শতাংশ। আলোচ্য দশকে তা কমে হয় ৯.৩ শতাংশ। অন্যদিকে জন্মহার আগের দশকের (২৫.৫) তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি পায় (২৫.৯ শতাংশ)।

এছাড়া এই দশকে জেলায় মোট জনাগম হয়েছিল ৭৫,৯৮৭ জন। অর্থাৎ জেলার মোট জনসংখ্যার প্রতি ৩০ জনে ১ জন ছিলেন বহিরাগত। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত মানুষের সংখ্যা ছিল ৩৩,৫৩৩ জন, অর্থাৎ জেলার জনসংখ্যার ১.৪৬ শতাংশ।

১৯৫১-৬১ দশক থেকে রাজ্য ও জেলার তুলনামূলক জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিতে এক নতুন ধারা শু(হয়। এর আগের দশকগুলিতে অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকের মধ্যে একটি দশক (১৯২১-৩১) ছাড়া প্রতিটি দশকে রাজ্যের তুলনায় জেলার জনসংখ্যা স্বল্পহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৫১-৬১ দশকে ও তার পরবর্তী চারটি দশকে জেলার জনসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধিলাভ করে।

১৯৬১-৭১ জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৮.৩৯ শতাংশ। এ সময়ে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬.৮৭ শতাংশ। উভয় (ে(ত্রেই এই হার পূর্ববর্তী দশকটির তুলনায় কম। জন্মহার রোধের জন্য ধারাবাহিক সরকারী প্রচার এর অন্যতম কারণ। আরেকটি কারণ ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার সুযোগ কমে যাওয়া।

ল(্যণীয়, যে জঙ্গীপুর মহকুমায় ১৯৫১-৬১ দশকে জনবৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ছিল, সেখানে ১৯৫১-৬১ দশকে জনবৃদ্ধির হার সর্বাধিক। গঙ্গা-পদ্মার ওপরে ফরাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য দ(ও অদ(শ্রমিকের বিপুল সংখ্যায় আগমন ও অভিবাসন এর অন্যতম কারণ।

১৯৭১-৮১ কালপর্বে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৫.৭৫ শতাংশ ও রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৩.১৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২৪.২২)-এর তুলনায় জেলার শহরাঞ্চলে জনবৃদ্ধির হার অনেকটা বেশী (৩৯.২৮)। মহকুমাগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক সদর মহকুমায় (২৯.৯২ শতাংশ)।

১৯৮১-৯১ জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৮.১৯ শতাংশ ও রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৭৩ শতাংশ। এই দশকটিতেও গ্রামের তুলনায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী, অর্থাৎ পূর্ব দশকগুলির মতো গ্রাম-শহর অভিবাসন অব্যাহত ছিল এ দশকেও। জঙ্গীপুর মহকুমার জনবৃদ্ধির হার মহকুমাগুলির মধ্যে সর্বাধিক।

১৯৯১-২০০১, এই দশকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৩.৭০ শতাংশ অর্থাৎ আগের দশকের তুলনায় জনবৃদ্ধির হার কম। গ্রামাঞ্চলে জনবৃদ্ধি (২০.৮৬ শতাংশ)-র তুলনায় শহরাঞ্চলে জনবৃদ্ধি (৪৮.১৪ শতাংশ)-র হার বেশি। অর্থাৎ আগের দশকগুলির মতই গ্রাম-শহর অভিবাসন এ দশকেও অব্যাহত থেকেছে।

লিঙ্গ অনুপাত

যে কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দুটি গু(ত্বপূর্ণ উপাদান হলঃ (১) নারী ও পু(ষের অনুপাত বা লিঙ্গ অনুপাত (Sex Ratio) (২) নারী-পু(ষ ভেদে জনসংখ্যার গঠন (Age Sex Composition)।

প্রতি হাজার পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যাকে বলা হয় লিঙ্গ অনুপাত। উন্নত দেশে বা উন্নত অঞ্চলে নারী পু(ষের সংখ্যার ব্যবধান প্রায় থাকে না। কারণ নারীদের জন্য সেখানে পু(ষদের মত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ল(্য করা যায় উত্তর আমেরিকার হাজার পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা ১০৫৩, এশিয়ায় এই সংখ্যা ৯৬২ জন (১৯৯৫ সালের হিসেবে)।

আবার বিভিন্ন বয়সে নারী পু(ষের সংখ্যা বা অনুপাত এক থাকে না। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সে নারী পু(ষের সংখ্যাগত পার্থক্যও স্বাভাবিক। এই তথ্য থেকে তিনটি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

(ক) যে দেশে বা যে অঞ্চলে ১৫ বছরের নীচে এবং ৬৫ বছরের ওপরের জনসংখ্যা অর্থাৎ নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশী, সেই দেশে বা অঞ্চলে গড় বয়স (Mean Age) ও পরমায়ু

(Life Expectancy) খুব কম। সাধারণত, জনসংখ্যার বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে এই গঠন আদিবাসী সমাজে দেখা যায়।

(খ) জন্ম হার যদি বেশী হয় ও শিশু-মৃত্যু আংশিক নিয়ন্ত্রণ করা যদি সম্ভব হয় তাহলে ১৫ বছরের নীচের জনসংখ্যা খুব বেশী হয়। জন বিবর্তনের এই পর্যায়ে শিশু-মৃত্যু কিছুটা কমলেও দারিদ্র, বেকারী, অপুষ্টিজনিত কারণে পরমায়ু বেশী হয় না। ফলে জনসংখ্যার গড় বয়স এই পর্যায়েও কম। উন্নয়নশীল অঞ্চলে এই অবস্থা দেখা যায়।

(গ) জনসংখ্যা গঠনের আর একটি পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু হার উভয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনেকটাই কাম্যস্তরে পৌঁছায়। উন্নত দেশে বা অঞ্চলে এই অবস্থা দেখা যায়।

স্ত্রী-পু(ষ অনুপাতের ভারসাম্যের অভাব হলে সমাজে তার প্রতিফলন ঘটে। যদি পু(ষ তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম থাকে তবে নারীকে বহির্জগতে বেশী কাজের দায়িত্ব নিতে হয়। একটি পু(ষ একাধিক বিবাহও করে থাকে। আবার যেখানে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম সেখানে সামাজিক জীবনযাত্রা হয়ে যায় বাধাবন্ধহীন।

এই তাত্ত্বিক আলোচনার পরিপ্রে(তে মুর্শিদাবাদ জেলায় নারী-পু(ষ অনুপাতের বিবর্তন আলোচনা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ এবং জেলা মুর্শিদাবাদের সঠিক পরিসংখ্যান ১৯০১ সাল থেকেই পাওয়া যায়। ল(্য করা যায়, ১৯০১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজারের হিসাবে পু(ষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কম (সারণী-৪.৪)। কিন্তু মুর্শিদাবাদে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপরীত চিত্র ল(্য করা যায়। এ(ত্রে হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা বেশী। মুর্শিদাবাদে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই বজায় আছে। এই অঞ্চলে শিল্প বলতে কুটিরশিল্পের প্রাধান্য রয়েছে। এই শিল্পে আবার নারীদের অবদান বেশী। যদিও দীর্ঘদিনের দারিদ্র এই সব পরিবারে একটি দারিদ্রের দুষ্টচত্রে(র সৃষ্টি করেছে। বহু বিবাহ, অশি(া ও অল্পবয়সে বিবাহের সঙ্গে জেলায় পারিবারিক শিল্পের গতি একইভাবে চলছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের পর প্রতি হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা কমলেও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক হিসাবের তুলনায় এই সংখ্যা বেশী। যেমন, ১০০০ জন পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা ১৯৭১-এ ৯৫৬ জন, ১৯৮১ তে ৯৫৯ জন এবং ১৯৯১-এ ৯৪৩ জন। আবার ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদে প্রতি হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা ৯৫২ জন, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৯৩৪ জন। নারী-পু(ষের অনুপাতের দৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদ জেলায় এই অনুপাত পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী।

এই (ত্রে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় ঃ (১) নারী-পু(ষ অনুপাতের গতিতে একটি দীর্ঘদিনের ভারসাম্যহীনতা আছে, (২) পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিক হিসাবের তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলায়

সারণী-৪.৪

প্রতি হাজার পু(ষ - প্রতি নারীর সংখ্যা

বছর	মুর্শিদাবাদ			পশ্চিমবঙ্গ		
	মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
১৯০১	১০৪০	১০৪৬	৯৪০	৯৪৫	৯৯৪	৬৫২
১৯১১	১০২২	১০২৮	৯৪১	৯২৫	৯৮২	৬১৪
১৯২১	১০০৬	১০১২	৯৩৫	৯০৫	৯৭১	৫৯১
১৯৩১	১০০৫	১০১১	৯২৬	৮৯০	৯৬১	৫৭৮
১৯৪১	৯৯০	৯৯৬	৯১৯	৮৫২	৯৪৫	৫৫৯
১৯৫১	৯৭৩	৯৭৮	৯২৩	৮৬৫	৯৩৯	৬৬০
১৯৬১	৯৭৪	৯৭৯	৯২০	৮৭৮	৯৪৩	৭০১
১৯৭১	৯৫৬	৯৫৮	৯৩৩	৮৯১	৯৪২	৭৬১
১৯৮১	৯৫৯	৯৫৮	৯৬৮	৯১১	৯৪৭	৮১৯
১৯৯১	৯৪৩	৯৪১	৯৫৯	৯১৭	৯৪০	৮৫৮
২০০১	৯৫২	৯৪৯	৯৭০	৯৩৪	৯৫০	৮৯৩

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

নারী-পু(ষের অনুপাত বেশী। সাধারণত উন্নত অঞ্চলে পু(ষ প্রতি নারীর অনুপাত বেশী থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মাপকাঠিতে মুর্শিদাবাদ জেলা পিছিয়ে। জেলার অর্থনীতি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বিভিন্ন ধরণের কুটির শিল্পের উপর নির্ভরশীল। আবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই জেলায় বিড়ি উৎপাদনের বিভিন্ন ফার্ম ত্র(ম-সম্প্রসারিত। বিড়ি উৎপাদনে (ে ত্রে এই অঞ্চল ভারতে অগ্রণী। এই উৎপাদনে মহিলাদের প্রয়োজন বেশী। তারা আপে(িকভাবে অল্প সময়ে অনেক বেশী বিড়ি উৎপাদন করে। এই কারণে জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় পরিবারের গড় আয়তন বেশী। উৎপাদনের প্রয়োজনে নারীরা মর্যাদাও পেয়ে থাকে। যদিও প্রতিটি পরিবারে রয়েছে দারিদ্র। কারণ অন্য(ে ত্রে পু(ষদের গড় উৎপাদন-শীলতা এই অঞ্চলে আপে(িকভাবে কম। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন দীর্ঘদিন ধরেই এই অঞ্চল অতি ধীরগতিসম্পন্ন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জেলায় তিনটি বিড়ি উৎপাদন (ে ত্র হল ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ ও সুতি। ফরাক্কার গ্রামাঞ্চলে পু(ষ জনসংখ্যা হল ৭৯,৫০৯ জন, আর নারীর সংখ্যা হল ৭৬,০৫৭ জন (১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী)। সামশেরগঞ্জেও এই সংখ্যা হল যথাত্র(মে ৭৯,২৬৬ জন এবং ৭৮,৪১৬ জন, আবার সুতিতে এই সংখ্যা যথাত্র(মে ১,০৪,২১৩ ও ১,০০,৮১৯ জন। প্রতিটি (ে ত্রেই পু(ষ-নারীর অনুপাত কাছাকাছি। অথচ এই সব অঞ্চল সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তি(গত উন্নয়নের দৃষ্টিতে পশ্চাদপদ। খুবই নিম্নমানের পরিকাঠামোতে এই অঞ্চলের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই বাঁচতে অভ্যস্ত। কিন্তু উন্নত অঞ্চলের মত হাজার পু(ষ প্রতি নারীর অনুপাত এই সব অঞ্চলে বেশী।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের তথ্যে দেখা যায় প্রতি হাজার পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা সামশেরগঞ্জে ১০০৮ জন এবং রঘুনাথগঞ্জে ১০০৫ জন। এই দুই অঞ্চলে ঐ সময় থেকেই বিড়ি উৎপাদন প্রত্রি(য়া বাড়তে থাকে। ল(ণীয়, বিড়ি উৎপাদনের সঙ্গে এই জেলায় লিঙ্গ-অনুপাত অনেকটাই জড়িত।

সারণী-৪.৫ -এ ল(্য করা যায়, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়সের মধ্যে প্রতি হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশী। আবার ঐ বছরেই ১,২ এবং ৩ বছর বয়সী নারীর সংখ্যা প্রতি হাজার পু(ষের চেয়ে বেশী। এই বয়সী নারীরা দু-দশক পরেই সন্তান উৎপাদনের (মতাসম্পন্না হয়। স্বাভাবিকভাবে এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিহারের সম্ভাবনা অন্যান্য জেলার চেয়ে বেশী। একদিকে প্রতি হাজার পু(ষ প্রতি নারীর সংখ্যা বেশী, অন্যদিকে দারিদ্র। আবার অন্য জেলার তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও এগিয়ে থাকায় জেলায় একটি দুষ্টুচত্র(অবস্থান করছে।

সারণী- ৪.৫

বিভিন্ন বয়সে প্রতি হাজার পু(ষ পিছু নারীর সংখ্যা

বয়স বিভাজন	পশ্চিমবঙ্গ	মুর্শিদাবাদ	
	১৯৬১	১৯৬১	১৯৯১
০	১০১৪	৯৯৯	-
১	১০৩৫	১০৪৯	-
২	১০২১	১০৩৩	-
৩	১০৪৬	১০১৯	-
৪	১০০০	১০০২	-
৫ - ৯	৯৮৫	১০০০	৯৭৩
১০ - ১৪	৮৪১	৮৬১	৯৩৬
১৫ - ১৯	৯২৬	১০১১	৮৩৯
২০ - ২৪	৯২৮	১০৯০	১০৩১
২৫ - ২৯	৮১৭	৯৭৮	১০৩১
৩০ - ৩৪	৭৬৩	৮৯৪	৮৯৮
৩৫ - ৩৯	৬৮২	৮১৪	৭৯১
৪০ - ৪৪	৭৩৬	৯৩১	৮৭৬
৪৫ - ৪৯	৭১৭	৮৬২	৯৩০
৫০ - ৫৪	৮১২	৯৮৬	৯৫২
৫৫ - ৫৯	৭৬৪	৯৪৮	৯৩৫
৬০ - ৬৪	৯৯৪	১১৮০	১০৩৭
৬৫ - ৬৯	৯৭৩	১০৬৭	১০৩০
৭০ +	১১৩০	১২৭৪	১০৪১

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৬১, ১৯৯১

প্রসঙ্গত্র(মে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কুজেনস্কির একটি বহু আলোচিত তত্ত্ব আলোচনা করা যায়। তাঁর মতে, কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের জন্মহার ও মৃত্যু হারের তারতম্যের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে না, তা সম্পূর্ণরূপে প্রজনন-(মতা- বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে প্রজনন (মতা বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের (সাধারণ ভাবে ১৫ বছর থেকে ৪৯ বছরের মহিলারা) সংখ্যা আপে(িক মানে বেশী। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ১৫ থেকে ১৯ বছর

সারণী- ৪.৬

লিঙ্গ অনুপাত ঃ ব্লক ও পৌরসভা ভিত্তিক চিত্র

ব্লক/পৌরসভা	১৯৯১	২০০১
ফরাক্কা	৯৪৫	৯৫৪
সামশেরগঞ্জ	৯৯১	৯৮৮
সুতি - ১	৯৭৪	৯৭৬
সুতি - ২	৯৬৬	৯৮২
রঘুনাথগঞ্জ - ১	৯৭১	৯৮৬
রঘুনাথগঞ্জ - ২	৯৬৭	১০৪১
সাগরদীঘি	৯৪২	৯৬২
লালগোলা	৯৩৪	৯৫৫
ভগবানগোলা - ১	৯৪১	৯৪১
ভগবানগোলা - ২	৯৩৫	৯৪৪
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৯৪৪	৯৩০
নবগ্রাম	৯৪৮	৯৫৬
রাণীনগর - ১	৯৩৯	৯৪৩
রাণীনগর - ২	৯১৫	৯৩০
জলঙ্গী	৯২৭	৯৩৭
ডোমকল	৯৩৩	৯৪১
খড়গ্রাম	৯৪৫	৯৫০
কান্দী	৯৪২	৯৩৭
ভরতপুর - ১	৯৪১	৯২৮
ভরতপুর - ২	৯৫৭	৯৫৭
বড়এ(া	৯৪১	৯৪৩
বহরমপুর	৯৪১	৯৪৭
হরিহরপাড়া	৯৩২	৯৩৬
নওদা	৯৩২	৯৪১
বেলডাঙ্গা - ১	৯০৫	৯২৫
বেলডাঙ্গা - ২	৯২৩	৯২৭
পৌরসভা ঃ		
ধুলিয়ান	৯৯২	৯৯৬
জঙ্গীপুর	৯৫৪	৯৫০
জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ	৯৫৩	৯৭২
মুর্শিদাবাদ	৯৭০	৯৬০
কান্দী	৯৩২	৮৯৩
বহরমপুর	৯৫৭	৯৫৮
বেলডাঙ্গা	৯৫২	৯৩৮

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

বয়সের মহিলার সংখ্যা ১,৯৪,৩১২ (মোট জনসংখ্যার ৮.৪৪ শতাংশ)(২০ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ২,১১,৪৫৯ (৯.২ শতাংশ)(২৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ২,৬,২৬৫ (৮.৯৬ শতাংশ)(৩০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ২,৭৯,৮৮৫ (১২.১৬ শতাংশ) এবং ৪০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে এই সংখ্যা ১,৭৫,৩১৭ (৭.৬১ শতাংশ)। ল(ণীয়, ৩০ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে মহিলার সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী। অশি(ত সংস্কারাচ্ছন্ন, স্থায়ী রোজগারের সুযোগ থাকা এই বয়সের মহিলাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পেছনে কোন বাধা নেই। সুতরাং জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের গতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

যে কোন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পরিমাপের জন্য একটি সূত্রই সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সূত্রটি মানুষ ও জমির অনুপাতের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। সূত্রটি হল ঃ

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট জমির পরিমাণ}}$$

জমির পরিমাণ বা আয়তন বর্গ-কিলোমিটারে মাপা হলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে জনসংখ্যা প্রকাশ করে। যদিও অনেকের মতে, মানুষ-জমির অনুপাত কেবল পরিসংখ্যানগত হিসাবে প্রকাশ করে না। এটি একই সঙ্গে একটি গুণনির্দেশক পরিমাপক ধারণা। কারণ, এই অনুপাত নির্ণয়ে অঞ্চলের জমির কৃষি উৎপাদন (মতাসহ সম্পদ উৎপাদনের কাজে জমির অন্যান্য ব্যবহারকেও বিবেচনা করা হয়।

নদী-নালা ও ব্যবসা ভিত্তিক মুর্শিদাবাদ দীর্ঘকাল ভারতের মানচিত্রে অন্যতম সম্প্রসারণশীল অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদ ছিল সুবা বাংলার রাজধানী। স্বাভাবিকভাবেই এই অঞ্চলে বাইরে থেকে জনসমাগম ঘটে। জেলাঞ্চলের কয়েকটি স্থানে জনঘনত্ব দেখা যায়। অন্তত দুইটি কারণে ঐ শতকে জেলার লালবাগ, কাশিমবাজার ও জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে জনঘনত্বের ব্যাপকতা দেখা যায় শাসকদের বসবাসকে কেন্দ্র করে এবং ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে। বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসাবে কাশিমবাজারেও লোকঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার রাণী ভবানীর বড়নগর, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়কৃত জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে বিভিন্ন মন্দির-এই সব অঞ্চলে জনঘনত্ব বাড়িয়ে ছিল। অন্যদিকে তৎকালীন প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল লালবাগ জনবহুল অঞ্চল হিসাবে খ্যাত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে,

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ল(্য করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অন্য অঞ্চলের চেয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ বেশী। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় দেখা যায়, এক বর্গ কিলোমিটারে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৯০৪ জন লোকের বাস, মুর্শিদাবাদে সেখানে ১১০১ জন লোকের বাস। জনঘনত্বে পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদের স্থান ষষ্ঠ। সারণী-৪.৭ -এ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জেলাঞ্চলে জনঘনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

সারণী-৪.৭

মুর্শিদাবাদ জেলায় জনঘনত্বের পরিবর্তন *

সাল	মোট	গ্রামীণ	শহরাঞ্চল
১৯০১	৬৩৮	৬১১	২৪৫৩
১৯১১	৬৪৯	৬১৪	২৬৯৮
১৯২১	৫৯১	৫৫৭	২৮৪০
১৯৩১	৬৬১	৬২৭	২৯৬৭
১৯৪১	৯৯২	৭৪৫	৩৮৯৩
১৯৫১	৮২৮	৭৭৫	৪৩৬১
১৯৬১	১১০৫	১০২৬	৬৩১৮
১৯৭১	৫৫০	৫১২	২৮৬৮
১৯৮১	৬৯৫		
১৯৯১	৮৯০	৮১৪	৪৬৩৫
২০০১	১১০১	৯৮৮	৫৬৮২

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

* *১৯০১-৬১ প্রতি বর্গমাইলে, ১৯৭১-২০০১ প্রতি বর্গ কিমিতে*

কলকাতার উত্থান ও মুর্শিদাবাদের গু(ত্ব কমে যাওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই জেলাঞ্চল থেকে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বাইরে চলে যায়। অনেকেই কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শু(করে। এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলায় ধীরগতিতে হলেও কুটিরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা সম্প্রসারিত হতে থাকে। নতুনভাবে এই জেলা এগিয়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই জেলায় জনঘনত্বও এই শতাব্দীতে বাড়তে থাকে। সারণীতে ল(্য করা যাচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত জনঘনত্ব ত্র(মশঃ বাড়তে থাকে। এই সময়ের মধ্যে জঙ্গীপুর মহকুমায়, বিশেষতঃ ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনঘনত্ব দেখা যায়। তার অন্যতম কারণই হল এই অঞ্চলগুলিতে বিড়ি কারখানার ত্র(মসম্প্রসারণ। ল(ণীয় বিষয় হল ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে জেলার জনঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮৯০ জন। এই সময়ে ফরাক্কায় ১৩৩৪ জন, সামশেরগঞ্জে ২২৬০ জন, রঘুনাথগঞ্জে ১২২৭ জন। অর্থাৎ জেলায় এই অঞ্চলগুলির জনঘনত্ব অন্য অঞ্চলের চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে বেশী। ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনায় জেলায় এই সংখ্যা হয় ১১০১ জন। অর্থাৎ আগের দশকের চেয়ে কিছুটা বেশী। কারণ এই সময়েই তুলনামূলকভাবে ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জে জনঘনত্ব বাড়ে। এই বিশেষত্ব প্রমাণ করছে, জেলা এখনও বিড়িশিল্প নির্ভর। মুর্শিদাবাদ পশ্চাদপদ কৃষিপ্রযুক্তি((তুলনামূলকভাবে) নির্ভর জেলা হলেও এই জেলা দীর্ঘদিন ধরেই গার্হস্থ্য বা পারিবারিক উৎপাদন (মূলত বিড়ি উৎপাদন) ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলা যায়, জেলায় সম্পদের উপযুক্ত(ব্যবহার হচ্ছে না। প্রসঙ্গত্র(মে উল্লেখ করা যায়, ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ১৯৮৭, নিরন্তর উন্নয়ন বা সাস্টেনেবেল ডেভেলপমেন্ট এর একটি সরলীকৃত সংজ্ঞা দিয়েছেন। এটি হল এমন উন্নতি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে ঘাটতি না ঘটিয়ে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ করবে। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন যা পরিবেশের স্থায়ী (তি করা থেকে যতটা সম্ভব বিরত করবে। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে উপকরণের সদ্ব্যবহার যে এমনভাবে করা হচ্ছে না তা জনঘনত্বের তারতম্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন তথ্য থেকে একটাই সিদ্ধান্ত, রাজধানী হিসাবে গু(ত্ব হারাবার পর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে অর্থনীতির যে ধরণের সম্প্রসারণ ঘটছে তা মোটেই উপকরণের ব্যবহারে সাহায্য করছে না।

এই পটভূমিকাতেই বলা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের জনসংখ্যার স্বরূপ বি(-ষণ আঞ্চলিক তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলে জনসংখ্যা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। (১) জন্ম, (২) মৃত্যু ও (৩) প্রব্রজন (Migration)। তাত্ত্বিক বি(-ষণে দেখা যায় কোন অঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস এই তিনটি কারণের বাইরে ঘটতে পারে না। এই সব কারণ ছাড়াও জেলাঞ্চলে গবেষণায় দেখা যায়, জৈবিক ও সামাজিক কারণেও এখানে জনসংখ্যা বাড়ছে। জৈবিক কারণগুলি হল বয়স, লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদি। সামাজিক বিষয়গুলি হল বিবাহ, শি(া, বৃত্তি, সামাজিক শ্রেণী ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায় জৈবিক ও সামাজিক কারণগুলি বিশেষ ভাবে কাজ করেছে। এই মহকুমায় দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে বিড়ি উৎপাদন সম্প্রসারিত। শ্রমনিবিড় এই শিল্প এই অঞ্চলে ত্র(মে সম্প্রসারিত। ভারতের প্রথম সারির বড় বড় কোম্পানীগুলির কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এই অঞ্চলেই।

কয়েক ল(শ্রমিক প্রত্য(ভাবে এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে তাৎ(ণিক রোজগারের পথ থাকায় এই শিল্পের উপর পু(ষানুত্র(মে অনেক পরিবার একটি স্থায়ী আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছে। পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানেই আয় বৃদ্ধি, এই মানসিকতা অনেকাংশেই এই অঞ্চলে কাজ করে। এর ফলে অল্প বয়সে বিবাহ, বহু বিবাহ, জন্মহার বৃদ্ধি এই সব বিষয়গুলি এসে পড়েছে। একটি সমী(ায় দেখা যায়, বিড়ি শিল্পের শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ শিশু শ্রমিক যাদের বয়স ৯ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। যে মেয়ে সারাদিন হাজারখানেক বিড়ি বাঁধতে পারে বিয়ের বাজারে তার চাহিদা বেশী। মেয়ে বিড়ি বাঁধতে পারে, সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহের বাধা নেই, পরিবারের আয়তন বৃদ্ধিতেও বাধা নেই, যার ফলে এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অন্যান্য যে কোন অঞ্চলের চেয়ে বেশী। এছাড়াও ল(্য করা যায় জঙ্গীপুর মহকুমায় যে যে অঞ্চলে পারিবারিক প্রথায় বিড়ি উৎপাদন হয় এবং পরিবার এই উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল, সেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলো মিটারে জনঘনত্ব(Density of Population) বেশী । যেমন ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জে এই সংখ্যা ২২৬০ জন (জেলায় সবচেয়ে বেশী), রঘুনাথগঞ্জে ১২২৭ জন।

জনসংখ্যাঃ গ্রাম ও শহর

২০০১ -এর জনগণনা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ (৭১.৯৭ শতাংশ) গ্রামে বাস করেন। মুর্শিদাবাদে জেলার (ে ত্রে এই অনুপাত অনেকটা বেশী। এই জেলার ৮৭.৫১ শতাংশ মানুষ গ্রামবাসী এবং মাত্র ১২.৪৯ মানুষ শহরবাসী। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলাতে ২২২০ টি গ্রাম, ৭টি পৌরসভা, ১১টি নন-মিউনিসিপ্যাল টাউন এবং একটি আর্বান আউটগ্রোথ ছিল। ২০০১ সালে জনগণনা অনুযায়ী জেলায় গ্রামের সংখ্যা ২২১০ টি, পৌরসভা ৭টি এবং সেন্সাস টাউন ২২টি। এক দশকে একটি আর্বান আউটগ্রোথ এবং ১১ টি গ্রাম সেন্সাস টাউনের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যদিকে একটি সেন্সাস টাউন তার মর্যাদা হারিয়ে আবার গ্রামীণ মৌজায় পরিণত হয়েছে।

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার প্রকৃতি নিয়ে বিশদ আলোচনার আগে জনগণনা প্রত্রি(য়ায় গ্রাম ও শহরের সংজ্ঞা ও ধারণা নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৩১ সালে জনগণনার প্রতিবেদনে তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার লিখেছিলেন, 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে গ্রাম ও শহর বিভাজন করা সহজেই সম্ভব। কিন্তু গ্রামের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা তত সহজ নয়।' জনগণনায় মৌজা ও গ্রামকে সমার্থক ধরা হয়। ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রাজস্ব-সমী(া বা রেভিনিউ সার্ভে দ্বারা নির্ধারিত মৌজাগুলিকে এখনও জনগণনার একক রূপে ধরা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে হয় ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে। সে সময় রাজস্ব-সমী(ার সবকটি মৌজার সীমানা চিহ্নি(ত করা যায়নি। তার প্রতিফলন জনগণনাতেও পড়ে। কখনও রাজস্ব সমী(ার মৌজাকে, কখনও বসতি-গ্রামকে জনগণনা-গ্রাম রূপে ধরা হয়। ১৯০১ সালে বাংলার সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন ই.এ. গেইট। তাঁর কথায়, 'গ্রাম বলতে কয়েকটি বসতবাড়ীর সমাহার বোঝাতে পারে, যার আলাদা গ্রাম-নাম আছে। কোন(ে ত্রে সমী(ার অনুসরণে গ্রাম অর্থে মৌজা বোঝাতে পারে। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি অনুসরণ করা সুবিধাজনক। সমী(াকালীন সীমানা চিহ্নি(ত করা গেলে এই 'একক' টির এলাকাও নির্ধারণ করা যাবে। কিন্তু এই সীমানা বা এলাকা কখনও বসতি-গ্রামের সমার্থক নয়। দুটি মৌজা নিয়ে একটি বসতি-গ্রাম হতে পারে। একটি মৌজায় কোন বসতি নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে, সমী(ার একক (মৌজা) গুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামের যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এমন অনেক বসতি আছে যাকে গ্রাম বলা যেতে পারে। আবার বলা যেতে পারে ঐ বসতিটি কোন গ্রামের একটি পাড়া মাত্র। বাংলায় রাজস্ব সমী(ার তথ্যগুলিকে আপ-টু-ডেট করা হয়নি এবং অধিকাংশ জেলাতেই সমী(ার মৌজার সীমা স্পষ্টভাবে চিহ্নি(ত করা যাচ্ছে না। সুতরাং এই জনগণনায় গ্রাম হিসাবে ধরা হয়েছে পৃথক গ্রামনাম আছে এমন বসতি অর্থাৎ কয়েকটি বসতবাড়ীর সমাহার এবং ঐ বসতির উপর নির্ভরশীল পাড়াগুলিকে। বিহার ও উড়িষ্যার অংশবিশেষে, যেখানে সম্প্রতি ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে হয়েছে, সেখানে সমী(ার মৌজাগুলিকেই জনগণনা-একক ধরা হয়েছে।'

১৯১১ সালের জনগণনা প্রসঙ্গে ওম্যালি লিখেছিলেন, 'বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে এবং কোচবিহারে জনগণনা-গ্রাম ও মৌজা বা সমী(া-একক সমার্থক। অন্যত্র জনগণনা-গ্রাম বলতে বোঝাবে ঐ নামের বসতি এবং তার উপর নির্ভরশীল পাড়াগুলি। সাধারণভাবে মৌজা ও বসতি-গ্রামের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু রাজস্ব-সমী(ার সময় বসতি না থাকায় যে মৌজাগুলিকে যথাযথভাবে ভাগ করা হয়নি সেগুলির (ে ত্রে গ্রাম ও মৌজার মধ্যে পার্থক্য দেখা যাবে। এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ হল মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল যেখানে মাত্র ১৯টি মৌজায় ২০০০০ -এরও বেশী গ্রাম ও পাড়া আছে। সুতরাং গ্রামের ধারণা অনেকটা অস্পষ্ট।'

১৯২১ সাল ও পরবর্তী জনগণনাগুলিতে রেভিনিউ সার্ভের

সারণী- ৪.৮
গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

বিষয়	বৎসর	পশ্চিমবঙ্গ			মুর্শিদাবাদ		
		মোট	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর
জনসংখ্যা	১৯৯১	৬,৮০,৭৭,৯৬৫	৪,৯৩,৭০,৩৬৪	১,৮৭,০৭,৬০১	৪৭,৪০,১৪৯	৪২,৪৫,৮০২	৪,৯৪,৩৪৭
	২০০১	৮,০২,২১,১৭১	৫,৭৭,৩৪,৬৯০	১,১৮,৮১,৬৬৬	৫৮,৬৩,৭১৭	৫১,৩১,৩৭৪	৭,৩২,৩৪৩
অনুপাত (শতাংশ)	১৯৯১	১০০	৭২.৫২	২৭.৪৮	১০০	৮৯.৫৭	১০.৪৩
	২০০১	১০০	৭১.৯৭	২৮.০৩	১০০	৮৭.৫১	১২.৪৯
এক দশকে বৃদ্ধি	১৯৮১-৯১	২৪.৭৩	২৩.০১	২৯.৪৯	২৮.২০	২৬.৬৮	৪২.৮৭
	১৯৯১-২০০১	১৭.৮৪	১৬.৯৪	২০.২০	২৩.৭০	২০.৮৬	৪৮.১৪
লিঙ্গ-অনুপাত	১৯৯১						
	২০০১	৯৩৪	৯৫০	৮৯৩	৯৫২	৯৪৯	৯৭০
সা(রতার হার	১৯৯১						
	২০০১	৬৯.২২	৬৮.০৬	৮১.৬৩	৫৫.০৫	৫২.৯৯	৬৯.০৩

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

মৌজাগুলিকেই গ্রাম বলা হয়েছে। বসতি-গ্রাম বা সামাজিক গ্রামের যে পরিচিত ধারণা তার সাথে এর কোন সঙ্গতি নাই। একটি মৌজায় একাধিক সামাজিক গ্রাম থাকতে পারে। আবার একাধিক মৌজা নিয়ে একটি সামাজিক গ্রাম গঠিত হতে পারে। কোন মৌজার অংশও সামাজিক গ্রামের অন্তর্ভুক্ত(হতে পারে।

১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সেসময় মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যার ৯২.১৪ শতাংশ গ্রামে বাস করতেন। ২০০১ সালের হিসাবে এই অনুপাত ৮৭.৫১ শতাংশ। অর্থাৎ অর্ধশতকে ছবিটা তেমন পাল্টায়নি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে গ্রামীণ জনসংখ্যার ঘনত্ব এই জেলায় ৯৮৮ জন। এ-বিচারে রাজ্যে জেলার স্থান চতুর্থ- হাওড়া, হুগলী ও উত্তর চব্বিশ-পরগণার পরেই এই জেলার স্থান। গত এক দশকে সেন্সাস শহরের সংখ্যা ১২টি বাড়লেও পৌরসভার সংখ্যা বাড়েনি। ১৯০৯ সালে ষষ্ঠ পৌরসভা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ধুলিয়ান। ৭২ বছর পরে ১৯৮১ সালে জেলার সপ্তম পৌরসভার স্বীকৃতি পায় বেলডাঙ্গা। তারপর পৌরসভার সংখ্যা আর বৃদ্ধি পায়নি।

মুর্শিদাবাদ জেলার ব্লক ভিত্তিক গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যার চিত্র পাওয়া যাবে সারণী- ৪.৯। এখানে ব্লকের অন্তর্গত সেন্সাস টাউনগুলির মোট জনসংখ্যাকেই শহরের জনসংখ্যা ধরা হয়েছে। সংলগ্ন পৌরসভাগুলির জনসংখ্যা ধরা হয়নি। পৃথকভাবে প্রতিটি সেন্সাস টাউন ও পৌরসভার জনসংখ্যা পাওয়া যাবে সারণী- ৪.১০ -এ।

এক দশকের জনবৃদ্ধি ঃ দেখা যাচ্ছে এক দশকের মোট জনবৃদ্ধির হার যেখানে ২৩.৭০ শতাংশ সেখানে গ্রামীণ জনবৃদ্ধির হার ২৫.৮৬ শতাংশ এবং শহরের জনবৃদ্ধির হার ৪৮.১৪ শতাংশ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে কোন দশকে গ্রামীণ জনসংখ্যা এত কম হারে বাড়ে নি। ১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় গ্রামীণ জনবৃদ্ধির হার ছিল ৩২.৪৯ শতাংশ। সেখান থেকে এই হার অবিরাম হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে এ রাজ্যে গ্রামীণ জনবৃদ্ধির হারে মুর্শিদাবাদ জেলার স্থান পঞ্চম। এবার তাকানো যাক ০-৬ বয়সের গ্রামীণ জনসংখ্যার দিকে। রাজ্যে ০-৬ বছর বয়সের শিশুর অনুপাত ১৭.৮৫ শতাংশ অর্থাৎ এ জেলার জন্মহার রাজ্যের তুলনায় বেশী।

১৯৮১-৯১ দশকে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৪২.৮৭ শতাংশ। ১৯৯১-২০০১ দশকে ঐ অনুপাত ৪৮.১৪ শতাংশ। শহরের জনবৃদ্ধির হারে মুর্শিদাবাদ এ রাজ্যে প্রথম।

সারণী- ৪.৯

ব্লক ভিত্তিক গ্রাম ও শহর, নারী ও পু(ষ ভিত্তিক জনসংখ্যা

ব্লক	গ্রামীণ জনসংখ্যা			শহরের জনসংখ্যা			মোট জনসংখ্যা		
	মোট	পু(ষ	নারী	মোট	পু(ষ	নারী	মোট	পু(ষ	নারী
ফরাক্কা	১৯৭৯৮১	১০১০৯৯	৯৬৮৮২	২১৭৯৪	১১৩৪৮	১০৪৪৬	২১৯৭৭৫	১২২৪৪৭	১০৭৩২৮
সামশেরগঞ্জ	১৩৮৩৯০	৬৯৬৯৭	৬৮৬৯৩	৭৩১৭১	৩৬৭৩০	৩৬৪৪১	২১১৫৬১	১০৬৪২৭	১০১১৩৪
সুতি-১	১৩৩৮৪৫	৬৭৮২৪	৬৬০২১	৫৫৭৪	২৭৩০	২৮৪৪	১৩৯৪১৯	৭০৫৫৪	৬৮৮৬৫
সুতি-২	১২৯০০৮	৬৫৫১০	৬৩৪৯৮	৮৪০৬১	৪১৯৯৬	৪২০৬৫	২১৩০৬৯	১০৭৫০৬	১০৫৫৬৩
রঘুনাথগঞ্জ -১	১৩২৩২২	৬৬৯৩৩	৬৫৩৮৯	২২০২৭	১০৭৯৪	১১২৩৩	১৫৪৩৪৯	৭৭৭২৭	৭৬৬২২
রঘুনাথগঞ্জ -২	১৬৫৪৮০	৮১১৯০	৮৪২৯০	২৭০২৫	১৩১৩৫	১৩৮৯০	১৯২৫০৫	৯৪৩২৫	৯৮১৮০
সাগরদীঘি	২৫২৩৬০	১২৮৫৯৬	১২৩৭৬৪	--	--	--	--	--	--
ভগবানগোলা-১	১৬৩৪৩৮	৮৪০৩৫	৭৯০৪৩	--	--	--	--	--	--
ভগবানগোলা-২	১২৯৯০৭	৬৬৮১৩	৬৩০৯৪	--	--	--	--	--	--
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	১৯৯৬২১	১০৩৪২১	৯৬২০০	--	--	--	--	--	--
নবগ্রাম	১৯৬৫৬৫	১০০৪৯১	৯৬০৭৪	--	--	--	--	--	--
লালগোলা	২৬৭৫৬৩	১৩৬৮৫৩	১৩০৭১০	--	--	--	--	--	--
রাণীনগর -১	১৪৬১২৪	৭৫২২২	৭০৯০২	৮৪৩৫	৪৩৪৩	৪০৯২	১৫৪৫৫৯	৭৯৫৬৫	৭৪৯৯৪
রাণীনগর-২	১৫৫৬১২	৮০৬৯৫	৭৪৯৭৭	--	--	--	--	--	--
জলঙ্গী	২১৫৫৩৮	১১১২৬৭	১০৪২৭১	--	--	--	--	--	--
ডোমকল	৩১১৬৮৩	১৬০৫৬২	১৫১১২১	--	--	--	--	--	--
খড়গ্রাম	২৩৪৭১৫	১২০৩৫২	১১৪৩৬৩	--	--	--	--	--	--
কান্দী	২৯২৯৫২	৯৯৬৩৬	৯৩৩১৬	--	--	--	--	--	--
ভরতপুর-১	১৫০৮৩৯	৬২৮১৬	৭২৬০১	--	--	--	--	--	--
ভরতপুর-২	১৫০১১৫	৬২২৮১	৭৩৪২২	--	--	--	--	--	--
বড়এ(া	২২৪৩১২	৯৫৪৩৯	১০৮৮৬৭	--	--	--	--	--	--
বহরমপুর	৩৫৫৯৪০	১৩৯৩১৩	১৭৩০৯১	২২৮৯০	১১৭৫৮	১১১৩২	৩৭৮৮৩০	১৯৪৬০৭	১৮৪২২৩
হরিহরপাড়া	২২১৭০৯	৮৯৫০৬	১০৭১৮৫	--	--	--	--	--	--
নওদা	১৯৬০২১	৭৯৩৯২	৯৫০২৪	--	--	--	--	--	--
বেলডাঙ্গা-১	২৫৯১৩৯	৯৯৮১৯	১২৪৫৩৭	--	--	--	--	--	--
বেলডাঙ্গা-২	২১০১৯৫	৮৪৬১৮	১০১০৮৮	--	--	--	--	--	--

সূত্র ঃ জেলা জনগণনা দপ্তর, মুর্শিদাবাদ

সারণী- ৪.১০
'সেন্সাস টাউন' ও পৌরসভার জনসংখ্যা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি

সেন্সাস টাউন/ পৌরসভা	আয়তন বর্গ কিমি	জনসংখ্যা ১৯৯১ মোট	১৯৯১ পু(ষ	১৯৯১ নারী	জনসংখ্যা ২০০১ মোট	২০০১ পু(ষ	২০০১ নারী	এক দশকে বৃদ্ধিহার	ঘনত্ব ২০০১	লিঙ্গ অনুপাত ১৯৯১	লিঙ্গ অনুপাত ২০০১
ফরাক্কা ব্যাঃ প্রঃ	৩.৭০	২১৪৮৫	১১৫৩৪	৯৯৫১	২১৭৯৪	১১৩৪৮	১০৪৪৬	১.৪৪	৫৮৯০	৮৬৩	৯২১
অনুপনগর	৪.৭৭	-	-	-	৯৯৬২	৪৯৮৯	৪৯৭৩	-	২০৮৮	-	৯৯৭
দুসারিপাড়া	৩.৩১	৯৭০৩	৪৮২৪	৪৮৭৯	১২১১৭	৬০৯১	৬০২৬	২৪.৮৮	৩৬৬১	১০১১	৯৮৯
উত্তর মহম্মদ পুর	০.৪৯	-	-	-	৬১৯২	৩১৩০	৩০৬২	-	১২৬৩৭	-	৯৭৮
কাঁকুড়িয়া	৩.৪৬	-	-	-	২৭৩৭২	১৩৬৪৩	১৩৭২৯	-	৭৯১১	-	১০০৬
চাঁচন্ডা	১.১৫	৭৩৫৮	৩৬৯৪	৩৬৬৪	১০৩০০	৫২৩৯	৫০৬১	৩৯.৯৮	৮৯৫৭	৯৯২	৯৬৬
শেরপুর	০.৬৩	৫৫৭৬	২৭৭৪	২৮০২	৭২২৮	৩৬৩৮	৩৫৯০	২৯.৬৩	১১৪৭৩	১০১০	৯৮৭
ফতেল্লাপুর	১.৯৬	-	-	-	৫৫৭৪	২৭৩০	২৮৪৪	-	২৮৪৪	-	১০৪২
ঔরঙ্গাবাদ	২.৭৭	২৫৮৬১	১৩০৬২	১২৭৯৯	৩২১৩৪	১৬০১১	১৬১২৩	২৪.২৬	১১৬০১	৯৮০	১০০৭
পশ্চিম পুড়াপাড়া	৭.২২	২৩৩৫৯	১১৮৩৬	১১৫২৩	৩১১৯৮	১৫৬১৪	১৫৫৮৪	৩৩.৫৬	৪০০১	৯৭৪	৯৯৮
দফাহাট	২.৭২	৭৮২৮	৩৯৮৪	৩৮৪৪	১১৩২০	৫৬৬৪	৫৬৫৯	৪৪.৬৫	৪১৬৩	৯৬৫	৯৯৯
জগতাই	০.৭১	৭১৯৪	৬৩১৬	৩৫৭৮	৯৪০৬	৪৭০৭	৪৬৯৯	৩০.৭৫	১৩২৪৮	৯৮৯	৯৯৮
ঘোড়শালা	৩.৬০	-	-	-	৬২৫২	৩১৪৭	৩১০৫	-	১৭৩৭	-	৯৮৭
চরকা	১.১৫	-	-	-	৫৮৭৮	২৬২১	৩২৫৭	-	৫১১১	-	১২৪৩
শ্রীকান্তবাটি	২.৬১	-	-	-	৯৮৯৭	৫০২৬	৪৮৭১	-	৩৯৪৩	-	৯৬৯
জোতকমল	১.৪৮	-	-	-	৬১৯৬	৩১১২	৩০৮৪	-	৪৯৮৬	-	৯৯১
শাহজাদপুর	১.৫৭	১৩৬১০	৬৮২৪	৬৭৮৬	১৫৭২০	৭৫১৭	৮২০৩	১৫.৫০	১০০১৩	৯৯৪	১০৯১
খোদারামপুর	০.৮৬	-	-	-	৫১০৯	২৫০৬	২৬০৩	-	৫৯৪১	-	১০৩৯
হরহরিয়াচক	১.৯৯	-	-	-	৮৪৩৫	৪৩৪৩	৪০৯২	-	৪২৩৯	-	৯৪২
কাশিমবাজার	২.৯৮	৮৭৫৩	৪৪৫৫	৮২৯৮	১০১৭৫	৫২৪৩	৪৯৩২	১৬.২৫	৩৬৬০	৯৬৫	৬৪১
গোরাবাজার	১.৯১	-	-	-	৭৭১৪	৩৯৮৮	৩৭২৬	-	৪৩০৯	-	৯৩৪
গোয়ালজান	১.৭৯	-	-	-	৫০০১	২৫২৭	২৪৭৪	-	২৬১৮	-	৯৭৯
লালগোলা	-	২৪৪৬৯	১২৫১৮	১১৯৫১	-	-	-	-	-	-	-
ধুলিয়ান	১০.২৭	৩৩১৯১	১৬৬৬৪	১৬৫২৭	৭২৯০৬	৩৬৫২৪	৩৬৩৮২	১১৯.৬৬	৭০৯৯	৯৯২	৯৯৬
জঙ্গীপুর	৭.৮৬	৫৫৯৮১	২৮৬৫৫	২৭৩২৬	৭৪৪৬৪	৩৮১৮৫	৩৬২৭৯	৩৩.০২	৯৪৭৪	৯৫৪	৯৫০
জিয়াগঞ্জ-আজিম	১১.৬৬	৪২১০৪	২১৫৬৩	২০৫৪১	৪৭২২৮	২৩৯৪৮	২৩২৮০	১২.১৭	৪০৫০	৯৫৩	৯৭২
মুর্শিদাবাদ	১২.৯৫	৩০৩২৭	১৫৩৯৫	১৪৯৩২	৩৬৮৯৪	১৮৮২৭	১৮০৬৭	২১.৬৫	২৮৪৯	৯৭০	৯৬০
বহরমপুর	১৬.১৯	১১৫১৪৪	৫৮৮৩৩	৫৬৩১১	১৬০১৬৮	৮১৭৯৫	৯৮৩৭৩	৩৯.১০	৯৮৯৩	৯৫৭	৯৫৮
বেলডাঙ্গা	৩.৯৮	২০২৪৯	১০৩৭৬	৯৮৭৩	২৫৩৬১	১৩০৮৮	১২২৭৩	২৫.২৫	৬৩৭২	৯৫২	৯৩৮
কান্দী	১২.৯৫	৩৯৬৫২	২০৫২৭	১৯১২৫	৫০৩৪৫	২৬৫৯৩	২৩৭৫২	২৬.৯৭	৩৮৮৮	৯৩২	৮৯৩

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

গত এক দশকে মুর্শিদাবাদে গ্রামীণ-জনসংখ্যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে সুতি-২ ব্লকে, তার ঠিক পিছনে আছে রঘুনাথগঞ্জ-১ এবং লালগোলা। সবচেয়ে কম জনবৃদ্ধি হয়েছে বড়এ(া ব্লকে, তারপরে আছে খড়গ্রাম ও ভরতপুর-১। এই অঞ্চলগুলিতে জন্মহারও কম। এই ৬টি ব্লকের জনবৃদ্ধি ও শিশুসংখ্যার হার নিচে দেওয়া হ'ল -

ব্লক	জনবৃদ্ধি(১৯৯১-০১)	০-৬ জনসংখ্যা
সুতি-২	৩৫.০৫	২১.৯৪
রঘুনাথগঞ্জ-১	৩০.০৯	১৮.৮৯
লালগোলা	২৯.৪০	১৯.৫০
বড়এ(া	১৩.৯১	১৫.৮৭
খড়গ্রাম	১৬.০৪	১৬.৮৪
ভরতপুর-১	১৬.৩৮	১৬.৭৮

শহরাঞ্চলের দিকে তাকালে দেখা যাবে, গত এক দশকে সর্বাধিক জনবৃদ্ধি হয়েছে ধুলিয়ান পৌরসভায় (১১৯.৬৬ শতাংশ)। অনেক পিছনে আছে দফাহাট (৪৪.৬৫) ও চাচন্ড(৩৯.৯৮), এই দুটি সেন্সাস টাউন। ধুলিয়ান পৌরসভার জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ এই কালপর্বে অনুপনগর মৌজার একটা অংশ ধুলিয়ান পৌরসভায় যুক্ত(হওয়া। জেলার শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধির যা হার তাতে ২০ বছরে পৌরসভাগুলির জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। এর সাথে গ্রাম-শহর অভিবাসনের উপাদানটিও আছে। এই বিপুল জনবৃদ্ধি পরিকাঠামো ও পরিষেবামূলক ব্যবস্থার ওপর যে চাপ সৃষ্টি করবে পৌরপ্রশাসন তা কেমনভাবে সামাল দেবে, এটা খুব জ(রী প্র(ে। জেলার যে তিনটি শহরের জনবৃদ্ধির হার কম সেগুলি হল ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপ (১.৪৫ শতাংশ) জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভা (১২.১৭ শতাংশ) এবং শাহ্জাদপুর সেন্সাস টাউন (১৫.৫০ শতাংশ)।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার বসতি-মৌজার সংখ্যা ১৯১৮। এবং বসতিহীন মৌজার সংখ্যা ৩০২ । ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলায় বসতি-মৌজার সংখ্যা ছিল ১৯২৩ এবং বসতিহীন মৌজার সংখ্যা ছিল ৩০৩।

স্থানিক বিভাজন (Spatial Distribution) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে মৌজার সংখ্যা ৪৪। মুর্শিদাবাদের গ্রামগুলি তুলনামূলকভাবে কম ঘনসন্নিবিষ্ট। এ জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে মৌজার সংখ্যা ৩৭। গ্রামের সর্বাধিক ঘনসন্নিবেশ দেখা যায় জিয়াগঞ্জ থানা এলাকায়। এই থানার গ্রামাঞ্চলে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে মৌজার সংখ্যা ১০৮। এরপরে আছে কান্দী মহকুমার বড়এ(া থানা। বড়এ(াতে প্রতি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে মৌজার সংখ্যা ৫৫। অন্যদিকে সদর মহকুমায় নওদা থানায় প্রতি ১০০বর্গ কিমিতে মৌজার সংখ্যা মাত্র ১২ টি অর্থাৎ গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। ডোমকল মহকুমায় জলঙ্গী থানাতে এই সংখ্যা মাত্র ১৬।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মৌজাপিছু গড় জনসংখ্যা ১৪১৬ জন। জেলায় গ্রামাঞ্চলে মৌজাপিছু গড় জনসংখ্যা ২৩২২ জন। এ হিসাবে রাজ্যে জেলার স্থান ষষ্ঠ।

১৯৯৯-২০০০ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল আউট লাইন অব্ ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত শহরের সংজ্ঞানুসারে যে তত্ত্ব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিপূরিত হলে কোন একটি অঞ্চলকে শহর হিসাবে গণ্য করা যাবে।

প্রথম শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে এক ল(অথবা তার বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে পঞ্চাশ হাজার থেকে নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই(৯৯৯৯৯)। তৃতীয় শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে কুড়ি হাজার থেকে ঊনপঞ্চাশ হাজার নয়শো নিরানব্বই (৪৯,৯৯৯)। চতুর্থ শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে দশ হাজার থেকে ঊনিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই (১৯,৯৯৯) পঞ্চম শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে পাঁচ হাজার থেকে নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই (৯,৯৯৯)। ষষ্ঠ শ্রেণীর শহর লোকসংখ্যা হবে পাঁচ হাজারের থেকে কম।

এছাড়াও শহরের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অঞ্চলকেই শহরাঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যদি --

ক) সেই অঞ্চল পুরসভা অথবা কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অথবা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত বোর্ডের অধীনে অবস্থান করে,

খ) সেই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ ৭৫ শতাংশ অকৃষি(ত্রে নিয়োজিত হয়,

গ) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব হয় অন্ততঃ ৪০০ জন।

১৯৯১ ও ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জেলার শহর গুলির শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হ'ল সারণী- ৪.১১ তে।

সারণী-৪.১১

শহরের শ্রেণীবিভাগ ঃ ১৯৯১, ২০০১

শ্রেণী	১৯৯১	২০০১
প্রথম	বহরমপুর	বহরমপুর
দ্বিতীয়	জঙ্গীপুর	জঙ্গীপুর, ধুলিয়ান, কান্দী।
তৃতীয়	ধুলিয়ান, কান্দী, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপ, লালগোলা।	জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙ্গা, ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপ, ঔরঙ্গাবাদ, পশ্চিম পুড়াপাড়া, কাঁকুড়িয়া।
চতুর্থ	শাহ্জাদপুর	দুসারিপাড়া, চাঁচন্ডা, দফাহাট, শাহজাদপুর, কাশিমবাজার
পঞ্চম	দুসারিপাড়া, চাচন্দা, শেরপুর, দফাহাট জগতাই, কাশিমবাজার	অনুপনগর, উত্তর--মহম্মদপুর, শেরপুর ফত্তেপুর, জগতাই, ঘোড়শালা, চরকা, শ্রীকান্তবাটি, জোতকমল, খোদারামপুর, হরহরিয়া চক্, গোয়ালজান, গোরাবাজার

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

নগরায়ণ

জেলার নগরায়ণ প্রত্রি(য়া শু(হয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও তাত্ত্বিক বি(-ষণ এই মতবাদকে সমর্থন করে।

কোন একটি জনপদ গ্রাম না শহর তা নির্ধারণ করার সর্বসম্মত মাপকাঠি নেই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানের পরিপ্রে(তে নগরায়ণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা উচিত। সপ্তম শতাব্দীর নগরায়ণ প্রত্রি(য়ার আলোচনা এইভাবেই করা যায়।

আলোচ্য সময়কালে জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীকে অবলম্বন করে কর্ণসুবর্ণ নগরের চরিত্র পায়। সপ্তম শতাব্দীতে প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা, অর্থের গতিশীলতা বৃদ্ধি, বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে গু(ত্ব বৃদ্ধি, শ্রমবিভাগের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ভাগীরথীর পশ্চিমপ্রান্তে রাঙ্গামাটি অঞ্চলে (অধুনা কর্ণসুবর্ণ) জনবসতি বাড়ে। ঐ অঞ্চলের তৎকালীন আয়তন, জনবসতির স্তর বিন্যাস, বস্তুগত সংস্কৃতির নিদর্শনের গুণমান প্রভৃতি বিষয়কে নগরের সূচকরূপে বিচার-বিবেচনা করলে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রাচীন বাংলার এই অঞ্চলটিতে নগরায়ণের সূচনা হয়েছিল।

প্রথমত প্রশাসনিক উপাদান ও ধর্মীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটেছিল কর্ণসুবর্ণে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে গৌড়ে(র ছিলেন রাজা শশাঙ্ক । কর্ণসুবর্ণে তিনি স্থাপন করেছিলেন তাঁর রাজধানী। জেলার রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া অঞ্চলে যদুপুর গ্রামে রাজবাড়িডাঙ্গা খনন করে পাঁচটি পৃথক নগরস্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে রক্ত(মৃত্তিকা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আছে। 'বিহার' শব্দের অর্থ বৌদ্ধমঠ। সুতরাং বলা যায়, বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র এবং তৎকালীন উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট শি(াকেন্দ্র ছিল রাঙ্গামাটিতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্ম ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য এখানে শি(ার্থীরা আসত। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন এবং তাঁর সময়ে কর্ণসুবর্ণ এলাকায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এটিও এই এলাকায় জনাগমের অন্যতম কারণ।

ধর্মকেন্দ্র ছাড়াও কর্ণসুবর্ণে নগরায়ণের সাহায্যকারী আর একটি উপাদান ছিল উর্বর কৃষি(ত্র। তৎকালীন তীর্থযাত্রীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই অঞ্চল ছিল আপে(কভাবে নীচু এবং প্রায়শই বৃষ্টিপাত হ 'ত। এই কারণে চাষবাস ছিল অবাধ এবং ফল ও ফুলের প্রাচুর্য ছিল। অঞ্চলটির আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ(। আশেপাশের গ্রামে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত শস্যের একটি বড় অংশ যে শহরে আসত রাজবাড়িডাঙ্গা (অন্য নামে কর্ণসুবর্ণ) উৎখননে তার প্রমাণ মিলেছে। উৎখননে দেখা যায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, উৎকৃষ্ট ও মোটা— এই তিন ধরণের চালই এলাকায় পাওয়া যেত। উৎখননকারীর বিবরণে পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলে গমও নিয়মিত

চাষ হ'ত। উন্নত কৃষিব্যবস্থা বা খাদ্যের যোগানের জন্য স্বাভাবিকভাবেই অন্য অঞ্চলের জনগণের কাছে অঞ্চলটি আকর্ষণীয় ছিল।

কর্ণসুবর্ণে তৃতীয় যে উপাদানটি নগরায়ণে সাহায্য করেছিল তা হ'ল, এই এলাকা মহাস্থানের মতো একটি বসতি এলাকার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। রাজধানী ছিল ঘন বসতিপূর্ণ। গোকর্ণ, শক্তি(পুর, মহলন্দি ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রাম ও বাণিজ্যকেন্দ্র রাজধানীর আশেপাশে গড়ে উঠেছিল। অন্য কথায়, কর্ণসুবর্ণকে কেন্দ্র করে অনেক অংশ জুড়ে সেই সময়ে জনবসতি গড়ে উঠেছিল।

নগরায়ণের আর একটি উপাদান সময়োপযোগী শি(া ব্যবস্থার অস্তিত্ব। একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, তৎকালীন কর্ণসুবর্ণ এলাকায় সময়োপযোগী শি(াব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। জনগণের একটি বড় অংশ বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

নগরায়ণ প্রক্রি(য়ার একটি বিশেষ উপাদান হল উপযুক্ত(যোগাযোগ ব্যবস্থা। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তৎকালীন ভাগীরথীর পশ্চিম তীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। গঙ্গা বা ভাগীরথী এবং তার উপনদী ও শাখানদীগুলির মাধ্যমে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সাথে এবং তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে বহির্বি(্বের সাথে যোগাযোগ হ'ত।

এছাড়াও সপ্তম শতাব্দীতে একটি স্থলপথের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পথটি এগিয়ে ছিল তাম্রলিপ্ত বা অধুনা তমলুক থেকে কর্ণসুবর্ণ এবং কর্ণসুবর্ণ থেকে দ(িণবাহী হয়ে বঙ্গদেশে। অনুমান করা যায়, এইসব পথ ধরেই সেই সময়ে কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বাণিজ্য চলত।

ঐ সময়ের বাণিজ্য দ্রব্যগুলি ছিল রেশম জাতীয় বস্ত্র সম্ভার, বাঁশ, পান, সুপারী, তেজপাতা ইত্যাদি। বর্ণনায় পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলার নদীপথ ছিল বাণিজ্যের অন্যতম উৎস। এ বিষয়ে যথেষ্ট সা(্য পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেসলি জেলায় একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে একটি ে-ট পাথরে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। এই লিপিতে মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। এর বাড়ী ছিল রক্ত(মৃত্তিকায় অর্থাৎ অধুনা কর্ণসুবর্ণে। তিনি তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন। তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল পূর্ব-দ(িণ সমুদ্রতীরের দেশে। এছাড়াও ঐ সময়ের নদীপথের আরো বিভিন্ন পাথুরে প্রমাণও পাওয়া যায়। এছাড়া সাম্প্রতিক উৎখননে যে সব পুরানিদর্শন পাওয়া যায়, তাতেই প্রমাণ হয় কর্ণসুবর্ণের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জল ও স্থলের বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল। এমন কিছু পুরানিদর্শন পাওয়া যায়, যেগুলি অঞ্চলের বাইরে থেকে আনা।

নগরায়ণ প্রক্রি(য়ার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মুদ্রার চলনশীলতা। কোন অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণের অন্যতম সূচক হল সেই অঞ্চলে মুদ্রার গতিশীলতা। তৎকালীন কর্ণসুবর্ণ এলাকার বাণিজ্য যথেষ্ট গতিশীল ছিল এবং রাজশক্তি(যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

রাজা শশাঙ্কের সময়কালে কর্ণসুবর্ণে ব্যাপকতম নগরায়ণ হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) তা নগরের বৈশিষ্ট্য হারাতে থাকে।

এরপরে দশম শতাব্দীর পরবর্তীকালে অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপালে (ভাগীরথীর পশ্চিমপারে) রাজা প্রথম মহীপালের সময়কালে (৯৮৮-১০৩১ খ্রীঃ) কয়েকটি বছরের জন্য জনসমাবেশ ঘটেছিল। এ সময়ে মহীপালনগর সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। নগরের পরিধি ছিল তিন থেকে চার ক্রে(াশ। রাজধানীর এলাকা প্রসারিত ছিল ভাগীরথীর দ(িণতীর পর্যন্ত। নদীর ও বন্যার জলতলের থেকে বেশী উচ্চতা, নদীর নৈকট্য, সুবিধাজনক অবস্থান ইত্যাদি রাজাকে এই অঞ্চলে প্রশাসন-কেন্দ্র স্থাপনে প্রভাবিত করেছিল।

জেলায় আবার নগরায়ণের সূচনা হয় যখন মুর্শিদকুলি খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল হিসাবে নির্বাচন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্বপারে লালবাগ অঞ্চলকে। এই সময় থেকেই জেলায় নগরায়ণের দ্বিতীয় পর্যায় শু(হয়।

নব নগরায়ণ (১৭০৪-১৭৬০) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভাগীরথী নদীর পূর্বদিকে জেলার অন্তত দুটি অঞ্চল নগরের মর্যাদা পেতে থাকে। নগর দুটি হল কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদ। এই দুটি জনপদে একে একে নগরের উপাদানগুলির সমাবেশ ঘটতে থাকে। এই উপাদানগুলির সমাবেশের কারণ ও তার প্রতিক্রি(য়া এই অংশে আলোচনা করা যায়।

আলোচ্য সময়ের কিছু আগে থেকেই জেলায় কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হিসাবে জেলার কাশিমবাজার অঞ্চল গু(ত্ব পেতে শু(করে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে, যখন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কাশিমবাজারে বাণিজ্যিক কারণে যাতায়াত শু(করে (ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৬১, পৃঃ ৩২)। এই ব্যবসায়ীরা প্রধানত রেশম বস্ত্রের ব্যবসা করত।

১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের কাছে কালিকাপুরে ডাচ্ কোম্পানী ব্যবসায়ের জন্য কুঠী স্থাপন করে। অন্ততঃ আটশ জন ব্যক্তি(এই কুঠিতে ব্যবসা-সংক্র(ান্ত কাজ করত। এর কিছুদিন পরে সৈদাবাদের কাছে ফরাসডাঙ্গায় স্থাপিত হয় ফরাসী ব্যবসায়ী উপনিবেশ। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই একই অঞ্চলে আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীগণ উপনিবেশ স্থাপন করে। জেলায় সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের কার্যকলাপ শু(করে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। ল(্য করা যাচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে জেলার কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে অনেক বিদেশী কোম্পানীর বাণিজ্য-উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জনসমাবেশও ঘটতে থাকে। নির্মিত হতে থাকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সড়ক।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে এই জেলা পূর্ব ভারতের একটি বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়। কাশিমবাজারকে কেন্দ্র করে আশেপাশে নতুন ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী হতে থাকে। বিদেশী বণিকরা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী এই অঞ্চলে সমবেত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবসায়ীগণ। ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যক্তি(র আগমন ও বসবাসকে কেন্দ্র করে জেলায় গড়ে ওঠে একটি সম্প্রসারিত বাজার। দ্রব্যের ক্র(য় বিক্র(য়ের পরিমাণ এত বাড়ে যে তৎকালীন পৃথিবীর যে কোন বড় বাজারের সঙ্গে এই বাজারের তুলনা করা যেত। জেমস্ গ্রান্টের বিবরণ থেকে জানা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলায় টাকশাল থেকে শুধু শুল্ক বাবদ ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে আয় ছিল ৩,০৪,১৩০ টাকা। প্রধানতঃ রেশম ব্যবসায়ে কাশিমবাজার ভারতের অন্যতম বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। কাশিমবাজারে ইংরেজ কারখানা এত গু(ত্বপূর্ণ ছিল যে, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের অন্যতম পরিষদ-ভবন হিসাবে তা ব্যবহৃত হত। লণ্ডনের পাবলিক রেকর্ড অফিস থেকে জানা যায়, ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে কাঁচা রেশমের রপ্তানীর পরিমাণ হয় ১,৩৪,১১৯ পাউণ্ড। বাণিজ্যিক কারণ ছাড়া জেলায় নগরায়ণের আর একটি কারণ হ'ল, এই জেলা ছিল ১৭০৪ থেকে এই শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজশক্তি(র প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল।

আলোচ্য সময়ে পরপর পাঁচজন প্রায় সার্বভৌম সুবাদার নবাবের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ নগরে । রাজধানীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন ঐ অঞ্চলে সমবেত হতে থাকে। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কাশিমবাজার এবং প্রশাসনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে মুর্শিদাবাদ ক্র(মশ নগরের মর্যাদা পেতে থাকে। ভাগীরথীর পূর্বদিকে মাত্র ৪ থেকে ৫ মাইলের ব্যবধানে দুটি নগর গড়ে ওঠে।

এই দুই অঞ্চলে নগরের অন্যান্য উপাদানগুলি পরিপূরক হিসাবে এসে যায়, যেমন জনসমাগম। বিশেষতঃ অভিজাত ও ধনী ব্যক্তি(দের সমাবেশ ঘটায় জেলায় আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হয়। সৌখিন দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। আমদানি ছাড়াও ঐসব দ্রব্যের অনেকাংশ এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হতে থাকে। হাতির দাঁতের কাজ, কাঁসা-পিতল শিল্প, অলঙ্কার, সোনার কাজ, রেশমের কাপড়, কুটির শিল্পের মাধ্যমে সাধারণবস্ত্র ইত্যাদি পণ্যগুলি জেলা অঞ্চলেই উৎপাদিতহতে থাকে। এছাড়াও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানাও গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে শ্রমনিবিড় শিল্পগুলি জেলাঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। আর একটি বিষয়ও নগরায়ণের উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই বিষয়টি হল টাকশাল স্থাপন।

বাণিজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে অন্য যে উপাদানটি স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে তা হল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। জেলাঞ্চলে এই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যথেষ্ট গতিশীল ছিল। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশেঠ পরিবারের সদস্য ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে টাকশাল নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পান। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হিসাবে মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রার আগমন ও নির্গমন হত। বিভিন্ন ধরণের মুদ্রার বিনিময় জগৎশেঠ পরিবারের মাধ্যমে ঘটত। অর্থাৎ এই পরিবার মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করত। সুদে টাকা দেওয়া, হুণ্ডিকাটা ইত্যাদি ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার কাজ জগৎশেঠ পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত হত। কলকাতা ও দিল্লী ছাড়াও এই পরিবারের পাটনা ও কাশীতে কুঠী ছিল। এসব কুঠী থেকে মুর্শিদাবাদে বাণিজ্য সংক্র(ান্ত টাকার লেনদেন হ'ত।

মুর্শিদাবাদে নগরায়ণ প্রক্রি(য়ার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রকৃতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি। জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আগমন ও বসবাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় কার্যকলাপ ও আচার-অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হয়। জেলায় ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের (বিশেষ করে বৈষ(ব ধর্মের) ে(ত্র ছিল। আলোচ্য সময়ে জনসমাগমকে কেন্দ্র করে এই দুই ধর্মের ক্রি(য়াকলাপ আরো সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি জৈন ধর্মের ে(ত্র প্রস্তুত হয়। প্রধানত ব্যবসায়ের জন্য জৈন ধর্মাবলম্বী অনেক পরিবার জেলায় আসেন ও স্থায়ীভাবে বসবাস শু(করেন। এইসব ব্যক্তি(ও পরিবারগণ ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠা ও

জৈন ধর্মাচরণ সম্প্রসারিত করেন। এর ফলে জৈনদের আগমন বাড়ে। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে ডিহি জৈনপুরী জৈনমন্দির আগে থেকেই জৈনদের কাছে বিখ্যাত ছিল।

এছাড়া মহিমাপুরে, জিয়াগঞ্জে, আজিমগঞ্জে, নসীপুরে অনেক জৈনমন্দির স্থাপন করা হয়। জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে পরেশনাথের মন্দির ভারতের জৈন সম্প্রদায়ের কাছে অন্যতম তীর্থ(ে ত্র হিসাবে বিবেচিত।

ধর্মীয় পটভূমির পাশাপাশি মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে নবাব আলীবর্দীর সময় পর্যন্ত নির্মিত স্থাপত্যগুলিও স্বাভাবিক ভাবেই নগরায়ণ প্রত্রি(য়াকে সাহায্য করেছিল। নগরায়ণের সাহায্যকারী এই সব বিষয়গুলি জেলায় জনসমাগম ঘটতে সাহায্য করে। ক্লাইভের লেখায় উল্লেখ পাওয়া যায়, ঐ সময় মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা লণ্ডনের চেয়েও বেশী ছিল।

প্রাচীন নগরগুলির অব(য় ও নতুন নগরের সূচনা ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদে নবাবের বসবাস থাকলেও নবাবদের আগের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক (মতা থাকে না। জেলায় শু(হয় প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা। মুর্শিদাবাদ থেকে গু(ত্বপূর্ণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হতে থাকে। আদালত, টাকশাল, রাজস্ব আদায় সংত্র(ান্ত অফিস কলকাতায় স্থাপিত হয়। জেলার অভিজাত সম্প্রদায়, রাজন্যবর্গ ও নবাব পরিবারের অনেকেই চলে যায় কলকাতায়। পুরাতন রাজা ও জমিদারদের রাজস্ব কোম্পানীর কাছে পাঠানোর জন্য চাপ বাড়ে। মুন্নিবেগম, জগৎশেঠ এবং আরো অনেক বিত্তবান ব্যক্তি(ও পরিবার ত্র(মশঃ কোম্পানী প্রশাসনের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। তাঁদের আভিজাত্য র(ার জন্য বিশাল ব্যয়ের পরিমাণ ত্র(মশঃ কমতে থাকে। পুরাতন স্থাপত্যের র(ণাবে(ণের অভাব দেখা যায়। অনেক বৃহৎ অট্টালিকা, মন্দিরের অনেকাংশ গঙ্গাগর্ভে চলে যায়। পূর্তদপ্তর থেকে যে নথি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় পলাশী যুদ্ধের আগের তৈরী বৃহৎ অট্টালিকা মুর্শিদাবাদে মাত্র একটি কি দুটি আছে। সেগুলি লালবাগে অবস্থিত। আর সবই র(ণাবে(ণের অভাবে ত্র(মশঃ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী কয়েক দশকে জেলায় অবনগরায়ণ প্রত্রি(য়ার আর একটি কারণ হল জেলা থেকে সম্পদের স্থানান্তর। কলকাতার কাছাকাছি বিভিন্ন কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে অনেক শ্রম-উপাদান জেলা থেকে কলকাতায় চলে যায়। এছাড়াও রাজস্বের একটি বড় অংশ জেলা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া প্রশাসনের তহবিলে চলে যায়। নবাব মীরজাফর (মতায় আসার পর কয়েকটি বড় পরগণার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানী শাসকদের প্রদান করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় যে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি বা কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলির উপরেও ত্র(মান্বয়ে আঘাত আসতে শু(করে।

কোম্পানীর শাসকগণ জেলায় উৎপাদিত রেশমজাত পণ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকলেন। এই পণ্যের পরিবর্ত হিসাবে অন্য পণ্য আমদানীর প্রচেষ্টা শু(হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানী মুর্শিদাবাদ জেলার প্রশাসনিক গু(ত্ব কমানোর চেষ্টা শু(করে। ঐ সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী পরিবর্তন সংত্র(ান্ত পরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং এ ব্যাপারে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বাংলার নবাবদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাগীরথীর পূর্বদিকে আট কিলোমিটার দীর্ঘ যে মুর্শিদাবাদ শহর উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, নবাব মীরজাফরের কাছে বিভিন্ন আর্থিক চাপের জন্য ঐ নগর র(ণাবে(ণ অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে আর্থিক ঋণ মেটাবার জন্য মীরজাফর ২৪ পরগণা ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কারণেই নবাব মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করেন। ফলে মুর্শিদাবাদে নবাবের আয়ের উৎস কমতে থাকে। এছাড়াও নবাব মীরজাফর ব্রহ্মপুর (অধুনা বহরমপুর) মৌজার চারশত বিঘা জমি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন।

পলাশী যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদে অবনগরায়ণ (De-urbanisation) এর যে গতি শু(হয় তার অন্যতম কারণ হ'ল নজিরবিহীন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ১৭৬৯ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, বন্যা ও মহামারী জেলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টিয়ে দেয়। জেলায় কয়েক ল(লোকের মৃত্যু, মহামারীর জন্য অনেকের স্থানত্যাগ ইত্যাদির ফলে জেলার জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক কমে যায়। কয়েকটি গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। উৎপাদনে শ্রমিকের অভাব দেখা দেয়। পণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়। জেলার অর্থনৈতিক উন্নতির গতি অনেক কমে যায়।

রেনেলের বিবরণে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুর্শিদাবাদের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সড়ক পথে অথবা নদী পথে যোগাযোগ ছিল। তাঁর বিবরণে দেখা যায়, মুর্শিদাবাদের সঙ্গে আগ্রা, বেনারস, বোম্বাই, দিল্লী হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজের যোগাযোগ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

থেকে বহরমপুরের সঙ্গে কলকাতার এবং জেলার অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। নতুন পথ তৈরী ও পুরাতন পথের সংস্কার করা হয়। কারণ বহরমপুর ছিল সেনা শহর। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের উপর দিয়ে রেলওয়ে লাইন স্থাপন সংক্র(ান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ঐ সময়ে কয়েকটি রাস্তা সংস্কার করা হয়। যেমন জিয়াগঞ্জ থেকে ভগবানগোলা, আমাইপাড়া থেকে পাটকেলডাঙ্গা, বহরমপুর থেকে গোপালপুর-ঘাট, বহরমপুর থেকে পাটিকাবাড়ী, ডাহাপাড়া থেকে রাধারঘাট, নবগ্রাম থেকে বাদশাহী সড়ক ইত্যাদি। প্রতিটি সড়কের সঙ্গে বহরমপুরের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর কলেজ (কৃষ(নাথ কলেজ) ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে জেলার প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে বড় ধরণের জেল ও পাগলাগারদ তৈরী হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মহিলা কলেজ ও বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন সংক্র(ান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বহরমপুর (কৃষ(নাথ) কলেজ ও অন্যান্য আধুনিক শি(ায়তন স্থাপনের পর জেলায় একটি শি(ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। অর্থাৎ বহরমপুরে শহর বা নগরের প্রায় সবকটি উপাদানেরই সমাবেশ ঘটতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে রেল চলাচল শু(হয়। ভাগীরথীর পশ্চিমপারে আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

নগর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে জনবসতি গড়ে ওঠা। ১৮৭২ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরের লোকসংখ্যা ছিল ২৭,১১০ জন, ১৮৮১ তে ২৫,৫৩৬ জন, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫,৭৯৮ জন। এই হিসেবে বহরমপুরকে তৎকালীন মাপকাঠিতে তৃতীয় শ্রেণীর শহরের মর্যাদা দেওয়া যেত। ল(ণীয় বিষয় হল পলাশীর যুদ্ধের পর বহরমপুরকে কেন্দ্র করে যে নগরায়ণ প্রক্রি(য়া ছিল তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্তিমিত হয়ে পড়ে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পর জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে থাকে(কখনও বা ঋণাত্মক হয়। ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা হ্রাস (-১৫৭৪) পায়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা সামান্য বাড়ে (+২৬২)। বেশ কয়েকটি কারণ এই নগরায়ণ প্রক্রি(য়াকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভাগীরথীর পূর্বদিকের কয়েকটি অঞ্চল ক্র(মশঃ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছিল। বড় ধরণের মহামারী দেখা দিয়েছিল। একটি হিসাবে দেখা যায়, ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে কলেরা রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৪৫২। এর মধ্যে মারা যায় ৩৮০৩ জন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা হয় ২২৪৪ জন এবং মারা যান ১১৪৮ জন। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ ধরণের জ্বরের রোগীর সংখ্যা ৩৩৮৯৬ জন এবং মারা যান ২১৭৮৮ জন। এই ধরণের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নাগরিকদের বাধ্য করে স্থান ত্যাগ করতে।

দ্বিতীয়ত ঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর থেকে সেনানিবাস সরিয়ে নেওয়া হয়। বহরমপুর ঐ সময় থেকে ক্যান্টনমেন্টের মর্যাদা হারায়। রাজশাহী বিভাগের সদর শহরের যে মর্যাদা বহরমপুর পাচ্ছিল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাও চলে যায়।

তৃতীয়ত ঃ ১৮৭০-৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় ধরণের বন্যায় বহরমপুর শহর (তিগ্রস্থ হয়। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে যে বন্যা হয় তাতে শহরের উপর দিয়ে বেশ কিছুদিন প্রায় আড়াই ইঞ্চি জল প্রবাহিত হয়েছিল। এরপরেই বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

চতুর্থত ঃ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে চিকিৎসার যে সুযোগ তৈরী হয়েছিল মুর্শিদাবাদে আলোচ্য সময়ে সেই পরিমাণে হয়নি। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরে যতগুলি চিকিৎসাকেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদে তার চেয়ে অনেক কম ছিল। যদিও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়, যেটি তৎকালীন বাংলার অন্যতম বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য সংক্র(ান্ত বিনিয়োগ জেলায় কম হয়।

পঞ্চমত ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেলায় রাস্তা-ঘাটের সংস্কার কম হয়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর জেলায় ১৭২ মাইল রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার হয়। জেলায় ঐ সময় মোট সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ছিল ৬৪৭ মাইল। কিন্তু মাত্র ২৮ মাইল ছিল পাকা রাস্তা (Metalled Road)। যেখানে ঐ সময়ে ২৪ পরগণায় পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ৫৮৪ মাইল এবং নদীয়াতে ছিল ১৪৮ মাইল।

ষষ্ঠত ঃ আলোচ্য সময়ে জেলায় সামাজিক বিনিয়োগ আপে(কভাবে কম ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে মুর্শিদাবাদে শি(া(ত্রে বিনিয়োগ অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কম হতে থাকে। সমসাময়িক তথ্যে দেখা যাচ্ছে ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২৪ পরগণা, নদীয়া ও যশোহরের তুলনায় মুর্শিদাবাদে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। শি(া(ত্রে কম বিনিয়োগ ঐ পর্যায়ে বহরমপুরের উন্নয়ন প্রক্রি(য়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সপ্তমত ঃ আলোচ্য সময়ে বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলার ত্র(মশঃ পিছিয়ে পড়ার অন্যতম একটি কারণ হল ধীরগতি শিল্পায়ন। শুধুমাত্র পরিষেবা ে(ত্রের উপর নির্ভর করে বহরমপুর নগর বিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু হাওড়া বা ২৪ পরগণা জেলায় শিল্প(ত্রে বিনিয়োগ বাড়ে। ঐ সব অঞ্চলে শিল্প(ত্র তৈরী করা হয়। সেই কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি দশকেই মুর্শিদাবাদ জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপে(া ২৪ পরগণা জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক ভাবে বেশী থাকে।

শিল্প(ত্রকে কেন্দ্র করে অন্য অঞ্চলে (যেমন ২৪ পরগণা জেলা) নগরায়ণ প্রত্রি(য়া ত্বরান্বিত হতে থাকে। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে মোট জনসংখ্যা ছিল ১০,২০,৫৭২ জন। ঐ সময়ে ২৪ পরগণায় লোক সংখ্যা ছিল ১৬,২৫,০০০ জন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা হয় ১৩,৫৩,৬২৬ জন এবং ২৪ পরগণায় হয় ২৪,৩৪,১০৪ জন। অর্থাৎ ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা বাড়ে ৩,৩৩,০৫৪ জন। কিন্তু ২৪ পরগণায় বাড়ে ৮,০৯,১০৪ জন। আবার ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হয় ১২,৬৮৬ জন। যেখানে ২৪ পরগণায় ১,০৯,৩২০ জন, আবার ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদে এই সংখ্যা হয় ২৪,১৫৬ জন। এই সময়ে ২৪ পরগণায় এই সংখ্যা হয় ২,০০,৫১৭ জন। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, পাশের একটি শিল্পকেন্দ্রিক অঞ্চলের তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলার কম হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জেলায় অবনগরায়ণ প্রত্রি(য়ার একটি অন্যতম ল(ণ।

ল(ণীয় বিষয় হল, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে যখন মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অঞ্চলে নগরায়ণের প্রত্রি(য়া শু(হয় তখন জেলার বাইরে থেকে অনেক মানুষ মুর্শিদাবাদে আসেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন জেলায় বহরমপুরকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় পর্যায়ে নগরায়ণ প্রত্রি(য়া শু(হয়, তখন বাইরে থেকে কমসংখ্যক লোক জেলায় আসেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে জেলায় বাইরে থেকে জনসমাগম একেবারেই কমে যায়। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বিহার থেকে এ জেলায় আসেন মাত্র ১৩২ জন। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই হার আরো কমে। ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আসেন মাত্র আটজন।

অষ্টমত ঃ মানুষ ও প্রকৃতি সৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা মুর্শিদাবাদে শহরীকরণ প্রত্রি(য়ায় বাধা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন মানুষ জেলা থেকে কলকাতা অথবা অন্যান্য স্থানে চলে যান। অনেকেই সম্পত্তি বিত্র(য় করে অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর করে। একটি অঞ্চল থেকে আর একটি অঞ্চলে চলে যাওয়ার প্রকাশ ঘটে সম্পত্তি ত্র(য়-বিত্র(য় সংত্র(ান্ত চিত্রের মাধ্যমে। ল(্য করা যায় আলোচ্য সময়ে জেলার সম্পত্তি সংত্র(ান্ত বিবাদ বেড়ে যায়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় সম্পত্তি সংত্র(ান্ত অপরাধী অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশী ছিল।

এই সব বিষয় বি(-ষণ করেই বলা যায়, পলাশী যুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরকে কেন্দ্র করে পরিষেবা ে(ত্রনির্ভর যে নগরায়ণ প্রত্রি(য়া শু(হয়েছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সময় থেকে বহরমপুর উন্নয়নের দিক থেকে সুস্থিত অবস্থায় থাকে। এই অঞ্চলে নগরায়ণের জন্য নতুন কোন উপাদান আর যোগ হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে মুর্শিদাবাদের কয়েকটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে শু(হয় নতুন করে নগরায়ণ প্রত্রি(য়া। এই অঞ্চলগুলি হল লালবাগ, জঙ্গীপুর, কান্দী। এই সব অঞ্চলগুলিতে প্রধানতঃ নগরায়ণ প্রত্রি(য়ায় দুটি উপাদান বিশেষভাবে কাজ করে— (১) মহকুমা কেন্দ্রিক অঞ্চল হিসাবে((২) স্কুল, কলেজ, কোর্ট এবং সরকারী অফিস স্থাপিত হওয়ায় সেবা(ত্রের সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে। এছাড়াও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অঞ্চল শহরের মর্যাদা পায়। এইগুলি হল বেলডাঙ্গা, লালগোলা, ধুলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ।

লালবাগ (মুর্শিদাবাদ) ঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তথ্য অনুযায়ী বাংলার নগর শ্রেণীর মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর ছাব্বিশতম স্থানে ছিল মুর্শিদাবাদ। সুবা বাংলার রাজধানী স্থাপনের সূচনাকালেই মুর্শিদাবাদের এই অঞ্চলটি শহরের মর্যাদা পেতে শু(করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুর্শিদাবাদকে যে প্রশাসনিক মর্যাদা দেওয়া হয় তা হ'ল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভা গঠন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ অঞ্চলে জনসংখ্যা হয় ৩৫,৫১৩ জন। ১৮৭২ থেকে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আবার ঋণাত্মক (-৭০৮)। এই সময়েও অঞ্চলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হারের চেয়ে অঞ্চল থেকে জনগণের প্রস্থানের হার বেশী। যদিও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি সামান্য।

ধুলিয়ানঃ ভৌগোলিক দিক থেকে ধুলিয়ানের অবস্থান ২৪°৪৯' উত্তর অ(াংশে এবং ৮৭°৬৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। ১৮৭২ সালের হিসেব অনুসারে বাংলার নগর শ্রেণীর মধ্যে এগারতম স্থানে

অবস্থান করেছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান শহর। মুর্শিদাবাদের উত্তর প্রান্তে ভাগীরথী-গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে ধুলিয়ান অবস্থিত। ধুলিয়ানের কাছ থেকেই গঙ্গা দুইটি দিকে প্রবাহিত হয়। একটি প্রবাহ চলে যায় পদ্মা নামে পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ)। অন্যটি মুর্শিদাবাদকে সমদ্বিখণ্ডিত করে ভাগীরথী নাম নিয়ে কলিকাতার দিকে প্রবাহিত হয়। ধুলিয়ানের উত্তর দিকে মালদহ জেলা। আর পরেই ঝাড়খন্ড প্রদেশ। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চল বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। গঙ্গার উপরে অবিস্থিত বলে ভাগীরথী ও পদ্মা উভয় নদীপথের সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার সড়ক পথেও পাশের প্রদেশ ঝাড়খন্ডের সঙ্গে সহজ যোগাযোগ রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার প্রায় সকল সুবিধাই এই অঞ্চল পেয়ে থাকে। এই কারণে প্রধানত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেই ধুলিয়ান শহরের মর্যাদা পেয়েছিল।

বিভিন্ন হিসেবে দেখা যায়, প্রধানত চাল, গম, ছোলা, ডাল, চিনি, তামাক, ইত্যাদি কৃষি নির্ভর দ্রব্যগুলি ধুলিয়ানের বাণিজ্য পণ্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ধুলিয়ানের পাশের শহর ঔরঙ্গাবাদ সৈন্য নিবাস হিসাবে গু(ত্ব পেলেও ধুলিয়ানের এই ধরণের কোন ঐতিহাসিক গু(ত্ব ছিল না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই প্রধানত বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে এই অঞ্চলে নগরোন্নয়নের প্রক্রি(য়া শু(হয়। বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই হিন্দু মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের অনেক ব্যক্তি(ঐ অঞ্চলে বসবাস শু(করেন। ধুলিয়ানে জৈন মন্দির যেমন আছে তেমনি বড় মসজিদ ও মন্দির আছে। এর অনেকগুলিই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরী।

১৮৭৮-৭৯ সালের পর থেকে ধুলিয়ানের উপর দিয়ে রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যের যোগাযোগ প্রধানত ধুলিয়ানের মাধ্যমেই ঘটত। মুর্শিদাবাদে কাশিমবাজার বন্দরের পর ধুলিয়ানই মুর্শিদাবাদের অন্যতম বন্দরের রূপ নিয়েছিল।

১৮৭২ সালের পর ধুলিয়ান - সামশেরগঞ্জের জনসংখ্যা ক্র(মাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর অন্যতম কারণ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের আগমন।

ব্যাবসায়ের দিক থেকে এই অঞ্চলটি যথেষ্ট সাফল্য পেলেও নগর শ্রেণীর পঞ্চম স্তর থেকে উন্নত হতে পারে নি। বাণিজ্য মূলধন শিল্প মূলধনে রূপান্তরিত হতেও পারেনি। তার কয়েকটি কারণ প্রসঙ্গক্র(মে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবনগরায়ণের কয়েকটি উপাদান ক্রি(য়াশীল হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত অঞ্চলেই এর প্রভাব পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ ধুলিয়ান সন্নিহিত অঞ্চলে গঙ্গা অবতল হওয়ায় অঞ্চলটি বন্যা প্রবণ হিসাবে চিহ্নি(ত। বড় বড় বন্যায় এই অঞ্চলটির ভোগৌলিক আয়তনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গঙ্গার গর্ভে এই অঞ্চলের অনেকাংশই বিভিন্ন সময়ে চলে গিয়েছে। কয়েকটি বছরের বড় বন্যার উল্লেখ পাওয়া যায় যখন ধুলিয়ানের অনেকাংশ গঙ্গার গর্ভে চলে যায়। এই বছরগুলি হল, ১৮২৩, ১৮২৮, ১৮২৯, ১৮৩৮, ১৮৫২, ১৮৭৭, ১৮৭৯, ১৮৮০। এই সময়ে গঙ্গার গতিপথেরও পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়তঃ গঙ্গা থেকে পদ্মা ও ভাগীরথীর উৎসমুখে ধুলিয়ান অঞ্চল অবস্থিত। ঐ উৎসমুখে ভাগীরথীতে জলপ্রবাহ মাঝে মধ্যেই কমে যায়। খরার সময় কোন কোন বছর ভাগীরথী - গঙ্গার সংযোগস্থল শুকিয়ে যেত। আবার বৃষ্টির সময় গঙ্গা - ভাগীরথী সংযুক্ত(হত। এই খরার সময়ে ধুলিয়ান অঞ্চলের মাধ্যমে নদীপথে বাণিজ্যও বন্ধ থাকত। অর্থাৎ ধুলিয়ানের বাণিজ্য ব্যবস্থায় মাঝে মাঝেই এই ধরণের অনিশ্চয়তা দেখা যেত। ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েক বছর এই অবস্থা দেখা গিয়েছিল। যেমন ১৮২২, ১৮৭৩, ১৮৭৪, ১৮৮১, ১৮৮৪ সাল। এই সময়ে ধুলিয়ানের উপর দিয়ে নদীপথে বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ ছিল।

এই সব কারণে প্রায় ৮ বর্গমাইল এলাকা- বিশিষ্ট ধুলিয়ান শহরে শিল্প(ত্রে বিনিয়োগ কম হয়েছে। পরিষেবা (ত্রও তেমনভাবে গড়ে উঠেনি। বিশেষ ভৌগোলিক সুবিধার জন্য এই অঞ্চল আলোচ্য সময়ে বাণিজ্য নগর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

উচ্চ কৃষি-নির্ভরশীলতা, পরিবহনের সুবিধা, কিছু (ত্রে শিল্প বিনিয়োগ ও ভৌগোলিক সুযোগ নিয়ে মুর্শিদাবাদে যে নগরায়ণ প্রক্রি(য়া শু(হয়েছিল ও প্রকাশ ঘটেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে থেকে সে প্রক্রি(য়ার অবনয়ন ঘটে। এই সব চিহ্নি(ত নগরগুলি কালক্র(মে স্থিতিশীল অবস্থায় থেকে যায়। কলিকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে পরিষেবা ও শিল্প (ত্রে বিনিয়োগ বাড়ে। ঐ সব অঞ্চলগুলি নগর শ্রেণীর উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু একদা উত্তর পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ নগর লালবাগ ও কাশিমবাজার ক্র(মশঃ অনেক পিছিয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদের লালবাগ অঞ্চল থেকেই কোর্ট অব ডিরেকটর রাজ্য ও রাজনীতি সংক্র(ান্ত নীতি নির্ধারণ করতেন। বিখ্যাত নন্দকুমার, জগৎশেঠ ইত্যাদিরা এই লালবাগ অঞ্চলেই বাস করতেন। নন্দকুমারের দশ সহস্র সৈন্য এবং নবাব পরিবারের কর্মচারী ও সৈন্যগণ এ অঞ্চলেই বাস করতেন। এদের বাসস্থান ও শিবির গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এই সব উপাদানের অস্তিত্ব ছিল। প্রায় একই সময়ে কাশিমবাজারও তার নগরের ঐতিহ্য হারাতে

থাকে। এই পরিবর্তনশীল সময়ে পরিষেবার উপর নির্ভর করে বহরমপুর নগরায়ণ প্রক্রি(য়ায় ধীরগতিতে এগোতে থাকে। জেলায় আর একটি অঞ্চল ধুলিয়ান বাণিজ্যকে নির্ভর করে নগরের মর্যাদা পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত জেলায় এই ভাবেই নগরায়ণ প্রক্রি(য়া বিকশিত হতে থাকে।

ধুলিয়ান - সামশেরগঞ্জ

বৎসর	**১৮৭২**	**১৮৮৯**	**১৮৯১**
মোট জনসংখ্যা	৩১৯০৫	৩৮৮২৫	৪৪৩২০

দশ বছরের তুলনা	১৮৭২-৮১	১৮৮১-৯১
	৬১২০	৫৪৯৫

জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জ ঃ ভাগীরথী নদীর দুই তীরে দুটি ভূ-খণ্ড হল জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ। এই দুটি ছোট অঞ্চল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুবা-বাংলার বাণিজ্যের ক্ষে ত্রে অন্যতম স্থান অর্জন করে। হিন্দু, মুসলিম ও জৈন ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবেও এই দুটি অঞ্চল পরিচিত হয়। বিশেষ করে বৈষ(ব ধর্ম ও জৈন ধর্ম এই দুটি অঞ্চলে যথেষ্ট গতি বৃদ্ধি করে।

বর্তমানে পৌর শহর জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জ (২৪°১৪' উঃ অ(াংশ, ৮৮°১৬' পূঃ দ্রাঘিমাংশ) মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমায় পরস্পরের পরিপূরক অঞ্চল হিসাবে পরিচিত। সুবা বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে মুর্শিদকুলি খাঁ এই অঞ্চলকে বেছে নেন। সেই সময় থেকেই জিয়াগঞ্জের গু(ত্ব বাড়তে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জিয়াগঞ্জে ও আজিমগঞ্জে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্মের লোক সমাবেশ হয়। এর অন্যতম কারণ হল এই দুইটি অঞ্চলে ব্যবসায়ী মূলধনের গতিশীলতা ঐ সময়ে বাড়ে। একটি বিবরণে দেখা যায় ১৭৭৬ সালে জিয়াগঞ্জ থেকেই ৮৭০০ মন গম ও চাল রপ্তানি হয়েছিল। ঐ সময়ে জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জে দ(ণ ভারত থেকে বিভিন্ন ব্যবসায়ী আসেন। তাঁরা খাদ্য শস্য ভারতের দ(ণাঞ্চলে পাঠাতেন। প্রতিমাসে ঐ সময়ে এই অঞ্চল থেকে খাদ্য শস্য রপ্তানি হত ১৪২৮৬ মন। ক্র(মশঃ জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জ ব্যবসায়ীদের বসবাসের ক্ষে ত্র হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের নদীপথ দিয়ে কলকাতায় খাদ্যশস্য রপ্তানি হ'ত। তৎকালীন বাংলার পশ্চিমভাগে জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ অন্যতম খাদ্যশস্যের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়। ১৭৬০ সালের একটি বিবরণে পাওয়া যায়, মুর্শিদাবাদে ঐ সময়ে কয়েকটি অঞ্চল বাণিজ্য কেন্দ্র এবং ব্যবসায়ের জন্য গু(ত্বপূর্ণ বন্দর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। এই অঞ্চলগুলি হ'ল ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ, কাশিমবাজার, ও সৈদাবাদ।

জিয়াগঞ্জের আগের নাম ছিল গাম্ভীলা। যদিও 'গাম্ভীলার' ভৌগোলিক আয়তন ও বর্তমানের জিয়াগঞ্জের আয়তনের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অনেক ছোট ছোট ভূ-খণ্ড যুক্ত(হয়েছে এই জিয়াগঞ্জে। গাম্ভীলা ছিল বৈষ(বদের একটি প্রসিদ্ধ পাট। নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত(শিষ্য পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্র(বর্তী এখানে বাস করতেন। জিয়াগঞ্জে বড় গোবিন্দ বাড়ী ও গোবিন্দ বাড়ী প্রধানতঃ এই দুইটি বাড়ী বৈষ(বদের অন্যতম ধর্মকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও জিয়াগঞ্জের দেবীপুরে এখনো দুইটি আখড়া আছে। একটি দেবীপুরের উত্তর-পূর্ব দিকে সাধকবাগে।

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের ইতিহাসের সঙ্গে রাণী ভবানীর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজিমগঞ্জের উত্তরদিকে রাণী ভবানী বসবাসের জন্য যে স্থান বেছে নেন তার নাম বড়নগর। ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীরে বড়নগর অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বড়নগর হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে বলা হত এই অঞ্চল বাংলার বারাণসী। বড়নগরের চারপাশ দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ ছিল। রাণী ভবানী তৎকালীন বাংলার জমিদারগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তাঁর সমস্ত জমিদারী থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা কর আদায় হ'ত। তিনি তাঁর সম্পত্তির অনেকাংশই ব্যয় করেছিলেন বড়নগরে হিন্দুদের বিভিন্ন মন্দির স্থাপন করার জন্য। তাছাড়াও এই অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পিতল ও কাঁসার দ্রব্য উৎপাদিত হত ও বাণিজ্য হ'ত।

আজিমগঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থান বি(ে-ষণ করলে দেখা যায়, ঐ অঞ্চলের উত্তর দিকে যেমন ছিল বড়নগর, যা হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান, আবার কিছুটা দ(ণ দিক থেকেই শু(হয় জৈনদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও তীর্থস্থান স্থাপন। পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় পরিবারের দীর্ঘদিনের বসবাস জিয়াগঞ্জ- আজিমগঞ্জের নগর সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে জৈন সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ঐ সময় থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে মোট জনসংখ্যার তুলনায় জৈন সম্প্রদায় বা মাড়োয়ার সম্প্রদায়ের লোকেদের অনুপাত অনেক কম হলেও ব্যবসার জগতে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব সব সময়েই উচ্চস্তরে ছিল। ঐ সময় মারোয়ারী সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রধানত ব্যবসায়ের কাজ কর্মই করত। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ তার ব্যতিক্র(ম ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর

প্রথম পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে কর্মরত ব্যক্তি(ও ব্যবসায়ীর মধ্যে দশ ভাগের ন' ভাগ ছিল এই মারোয়ারী সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে। মুর্শিদকুলি খাঁ এই অঞ্চলে মারোয়ারী সম্প্রদায়ের অন্যতম পৃষ্টপোষক ছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর সময়কালে যোধপুরের নাগর অঞ্চল থেকে আসেন জগৎশেঠ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি(মানিকচাঁদ। জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে কাছাকাছি জিয়াগঞ্জ থেকে দ(ণে বর্তমান নসীপুরের কাছে একটি অঞ্চলে এই সম্প্রদায় বসবাস শু(করেন। এই শেঠ পরিবার ছিলেন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত(। কালত্র(মে জেলাঞ্চলে এই শেঠ পরিবার অন্যতম অর্থ বিনিময়কারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই পরিবারকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে জৈন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটতে থাকে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, মহিমাপুর, লালগোলা, ঔরঙ্গাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলগুলি তাঁরা বেছে নেন ব্যবসা ও বসবাসের জন্য। ১৭৭৪ সালে রাজস্থানের বিকানীর থেকে আসেন দুধোরিয়া পরিবার। তাঁরা আজিমগঞ্জে বসবাস শু(করেন। হাজারিমল দুধোরিয়ার নেতৃত্বে ঐ পরিবার প্রধানত ব্যবসায়ের কারণে জেলায় আসেন। পরবর্তী কালে তাঁরা বাংলার অন্যতম বড় ব্যবসায়ী পরিবারে পরিণত হন। কলকাতা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জে তাঁদের কুঠি ছিল। তাঁদের প্রধান ব্যবসায়িক কেন্দ্র ছিল আজিমগঞ্জে। এই দুধোরিয়া পরিবার প্রথমে ছিলেন (ত্রিয় বর্ণের চৌহান সম্প্রদায়ভুক্ত(। পরে তাঁরা জৈন ধর্মে বি(াসী হন। মুর্শিদাবাদে এসে তাঁরা বিভিন্ন জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ সেগুলি ভাগীরথীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নদীগর্ভে চলে যায়।

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে ব্যবসা জগতে প্রভাবশালী ঐ জৈন সম্প্রদায়ের সামাজিক কাজকর্ম বি(-ষণ করলে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পরে তা হল ঃ ১) দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা একদিকে যেমন শান্তিপূর্ণ ভাবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন তেমনি অনেক (ত্রে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার - অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন, ২) অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের দীর্ঘ সময়ের অবস্থান ও অন্য দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (হিন্দু ও মুসলমান) তুলনায় সংখ্যাগত স্বল্পতা থাকলেও ব্যবসায়ের (ত্রে প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। ৩) অঞ্চলে তাঁদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল।

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে জৈন সম্প্রদায়ের কয়েকটি ল(ণীয় বৈশিষ্ট ছিল। প্রথমতঃ এদের মধ্য কোন পরিবার দরিদ্র হলেও কখনও ভি(াবৃত্তি করেনি। দ্বিতীয়তঃ এঁদের কেউ কৃষিকার্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেনি। তৃতীয়তঃ এঁদের অর্থ উপার্জনের প্রধান উৎস ছিল ব্যবসা ও মহাজনী কারবার। চতুর্থতঃ সংখ্যাগত দিক থেকে অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক (ত্রে এঁদের ভূমিকা গু(ত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় জৈন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ৯৭৫। তার মধ্যে অধিকাংশেরই বসবাস ছিল জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে। ঐ সময় জেলায় লোক সংখ্যা ছিল ১৩,৭২,২৭৪ জন। এই স্বল্প সংখ্যক পরিবারের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ের (ত্রে ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। এঁদের মধ্যে লছমীপৎ সিং দুগার পরিবার, নাহার পরিবার, দুধোরিয়া পরিবার ও নওলা(া পরিবার অন্যতম ছিল।

বর্তমান জিয়াগঞ্জের একটি অংশের আগের নাম ছিল বালুচর। বালুচর যদিও বালুচরী শাড়ির জন্য ইতিহাস খ্যাত তাহলেও তাঁত শিল্পের জন্য যে গ্রামগুলি স্মরণীয় তার মধ্যে প্রধান হল বাহাদুরপুর, বেলিয়াপুকুর, রামডহর, রমনাবাড়া, রণসাগর, আমডহর, বাগডহর ও আমাইপাড়া।

পলাশী যুদ্ধের পরে কলকাতার উত্থান ও মুর্শিদাবাদ ভূ-খণ্ডের অবনগরায়ণের পর্যায়ে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জেরও পতন পর্বের সূচনা হয়। প্রধানত ব্যবসাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই অঞ্চলে নতুন করে শিল্প (ত্র বা সেবা (ত্রের সম্প্রসারণ ঘটেনি। জিয়াগঞ্জ - আজিমগঞ্জের পাশের কৃষি নির্ভর গ্রামগুলির জনগণের কিছুটা অংশের সৌখিন পণ্যের বাজার ছিল এই অঞ্চল। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলেও স্থানীয় বাজার গড়ে ওঠায় জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের বাজার ছোট হতে থাকে। ছোট ছোট দোকানদারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে অর্থনৈতিক অবস্থা স্বাধীনতার পর এই দুই অঞ্চলে ছিল তা ত্র(মশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই এই দুটি অঞ্চল আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পর্যায়ত্র(মের দিক থেকে ত্র(মশঃ পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসাবে পরিচিত হয়।

১৯৬১ সালের সঙ্গে ১৯৯১ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বি(-ষণ করলে দেখা যায়, জিয়াগঞ্জে ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৮,২৬২ জন এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯৪২ জন বসবাস করত। ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা হয় যথাত্র(মে ৮৪,০৪০ জন এবং ১৪৮৪ জন। অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্বিগুণের বেশী বাড়লেও জনঘনত্ব কমেছে। অর্থাৎ জিয়াগঞ্জের প্রান্ত অঞ্চলে ঘরবাড়ি বাড়ছে। কিন্তু কলেজের সংখ্যা বাড়ে নি। উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রায় একই আছে। জিয়াগঞ্জে সরকারী অফিস বলতে ডাকঘর ও দূরভাষ কেন্দ্র । আজিমগঞ্জে দুইটি রেলষ্টেশনকে কেন্দ্র করে কিছু রেল কলোনি গড়ে উঠেছে। জনসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু অর্থনৈতিক (ত্রের (কৃষি (ত্র, শিল্প (ত্র, এবং সেবা (ত্রের) যদি কাম্য হারে সম্প্রসারণ না ঘটে তাহলে অবনগরায়ণের ল(ণ দেখা যায়। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের (ত্রে সেই বিষয়টিই সাম্প্রতিককালে ল(্য করা যাচ্ছে।

প্রব্রজন

কোন অঞ্চলের জনবিন্যাসের ধরণ পরিবর্তিত হয় দুটি উপাদানের প্রভাবে। একটি হল প্রব্রজন (Migration), অপরটি স্বাভাবিক জনবৃদ্ধি। দ্বিতীয়টি যথাসম্ভব বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। জেলার আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, জন্ম ও মৃত্যুর হার এবং গ্রাম-শহর ভিন্নতা কিভাবে জনবিন্যাসকে প্রভাবিত করে তা এই অধ্যায়ের অন্য অংশে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থায় প্রথম উপাদানটি নির্ভর করে মূলতঃ অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার অস্তিত্বের উপরে। যদি কোনও অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বাড়ে, নিয়োগের সুযোগ বাড়ে, শিল্পায়ন নির্ভর নগরায়ণের প্রবণতা দেখা যায়, তবে সে অঞ্চলের জনবৃদ্ধিতে এবং জনবিন্যাসের পরিবর্তনে প্রব্রজন গু(ত্বপূর্ণ নিয়ামক হয়ে ওঠে।

এই অধ্যায়ে প্রব্রজনের যে আলোচনা করা হয়েছে তা জনগণনা নির্ভর। সুতরাং প্রব্রজনের যে সংজ্ঞা জনগণনায় প্রযুক্ত(হয় তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কোন অঞ্চলে বসবাসকারী একজন মানুষকে গণনা করার সময় তার জন্মস্থান এবং গণনাকালীন বাসস্থান বিবেচিত হয়। ফলে অভিবাসন (inmigration or immigration) এবং প্রবসন (out migration or emigration) এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয় কেবলমাত্র জন্মস্থান ধরে। এই পদ্ধতি এবং নির্ধারিত সংখ্যা সম্পূর্ণ যথাযথ না হলেও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য। যত(ণ না অধিকতর গ্রহণযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যাবে জনগণনার তথ্যের উপরেই নির্ভর করতে হবে।

গত এক শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির ওপর প্রব্রজনের প্রভাব সামান্য। ১৮৭২ সালের জনগণনার কাল থেকে শু(করে এ পর্যন্ত কোন বিশেষ কালপর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনৈতিক কাজকর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেনি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়েনি। মাঝে মাঝে দু-একটি মাঝারি শিল্প, যেমন চালকল, চিনিকল(এখন বন্ধ), ইত্যাদি স্থাপিত হলেও এই শিল্পগুলি মরশুমি এবং তা স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের থেকে বেশী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে নি। ঔরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ানকে কেন্দ্র করে বিড়ি শিল্পের বিকাশ হলেও তা স্থানীয় মানব সম্পদকেই কাজে লাগিয়েছে। কেবলমাত্র রেললাইন পাতার কাজ করতে জেলার বাইরে থেকে বহু শ্রমিক, মূলতঃ আদিবাসী শ্রমিক এ জেলায় আসে। তাছাড়া ফরাক্কা ব্যারেজ যখন তৈরী হয়, তখনও অন্য জেলার শ্রমিকদের আগমন ঘটে এ জেলায়। আবার গত শতকই রেশমচাষ ও রেশমবয়ন, হাতির দাঁতের কাজ, কাঁসা ও পিতলের কাজ ইত্যাদি সুখ্যাত কুটির শিল্পগুলির অবনয়নের সা(ী। বাগড়ীর নদীগুলি পলি পড়ে মজে যাওয়া, বড় বড় বিলগুলি প্রথমে জলাভূমিতে এবং তা থেকে কৃষিজমিতে পরিণত হওয়ায় মাছচাষের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যাও কমতে থাকে। একটা সময়ের পর নতুন চাষের জমিও আর বার করা যায় না। ফলে জনাগমের উপযোগী পরিস্থিতি এ জেলায় আর থাকে না বললেই চলে।

অন্যদিকে প্রতিবেশী বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া ও মালদহ জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদের ভূমিহীন মজুরের সংখ্যাও কম। বীরভূম বা বর্ধমানের তুলনায় বড় বড় জোতদারের বা বড় কৃষিজোতের সংখ্যাও এ জেলায় বরাবরই কম। মুর্শিদাবাদে মোটামুটিভাবে মাঝারি ও (ুদ্র কৃষক ও ভাগচাষীর সংখ্যা বেশী। সম্ভাব্য প্রবসনকারীদের (immigrations) একটা বড় অংশ জেলার মধ্যেই কিছু না কিছু প্রান্তিক অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ সারা বছরই পায়। গ্রাসাচ্ছদন কোনরকমে চলে। ফলে কখনই তেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় জননির্গমণ বা প্রবসন হয় নি।

এ জেলায় কিছু ভূমিহীন শ্রমিক আসানসোল, দুর্গাপুর, ব্যারাকপুর ইত্যাদি অঞ্চলের খনিতে বা কারখানায় কাজ করতে যায়। মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রীদের কাজের সুনাম রাজ্যের তথা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আছে। প্রচুর রাজমিস্ত্রী এ জেলা থেকে অন্য জেলায় এমন কি ভিন্ন রাজ্যেও কাজ করতে যায়। এ জেলা থেকে সোনা ও হীরার কাজ করতে বহু শ্রমিক সুরাট, নাসিক, মুম্বাই ইত্যাদি স্থানে যায়। শ্রমিকের কাজ করতে পাঞ্জাবেও যায় বহু মানুষ। গৃহ পরিচারক ও পরিচারিকার কাজ করতে বেশ কিছু মানুষ ভিন্ন রাজ্যে যায়। অন্যদিকে কৃষি মরশুমে বীরভূম থেকে সাঁওতাল শ্রমিকদের আগমন হয় এই জেলায়। তবে এই প্রব্রজন অস্থায়ী চরিত্রের।

১৯৫১ জনগণনায় দেখা যায় রাজ্যের বাইরে থেকে জেলায় আগত জনসংখ্যা ছিল ৭৮,২৩৩ জন। এর মধ্যে ৫৮,৭২৯ জন এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অর্থাৎ দেশভাগের অভিঘাত ছিল এই জনাগম। সমগ্র পঞ্চাশের দশক জুড়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল মানুষের আগমন চলতে থাকে। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে প্রায় ১৪,৯০০ জন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এ জেলাতে আসেন। পরের পাঁচ বছরে আসেন আরও ১৬,৬১৩ জন। ১লা মার্চ ১৯৬০ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, এই একবছরে প্রায় ২০,০০০ মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এ জেলায় আসেন। ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৬১ সালের ১লা মার্চ সময়কালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে এই জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শু(করে দেন এমন মানুষের সংখ্যা ৩৩,৫৬৩ জন অর্থাৎ মোট অভিবাসনকারীর(৭৫,৯৮৭ জন) ৪৪.১৩ শতাংশ।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী অভিবাসনকারীর সংখ্যা সারণী - ৪.১২ -এ দেওয়া হল।

সারণী - ৪.১২
মুর্শিদাবাদ জেলার জনাগমের চিত্র

জন্মস্থান	গণনাস্থান	মোট	পু(ষ	নারী
	মোট	৪৭,৪০,১৪৯	২৪,৩৯,৩৪২	২৩,৩০,৮০৭
	গ্রাম	৪২,৪৫,৮০২	২১,৮৬,৯৫০	২০,৫৮,৮৫২
	শহর	৪,৯৪,৩৪৭	২৫,২৩,৯২	২,৪১,৯৬৫
অ) ভারত	মোট	৪৬,৬৯,১৭০	২৪,০২,৯০৩	২২,৬৬,২৬৭
	গ্রাম	৪১,৯৯,৫৩২	২১,৬৩,৪৬০	২০,৩৬,০৭২
	শহর	৪,৬৯,৬৩৮	২,৩৯,৪৪৩	২,৩০,১৯৫
১। পশ্চিমবঙ্গ	মোট	৪৬,৪৪,০৪০	২৩,৯৩,৯৯৩	২২,৫০,০৪৭
	গ্রাম	৪১,৮৩,৯৬২	২১,৫৯,০১০	২০,২৪,৯৫২
	শহর	৪,৬০,০৭৮	২,৩৪,৯৮৩	২,২৫,০৯৫
১(ক) গণনাস্থানে জন্ম	মোট	৩৬,২৯,৬২৬	২১,৯২,৪০৫	১৪,৩৭,২২১
	গ্রাম	৩২,৮৭,০৯৬	১৯,৯৪,৫৫০	১২,৯২,৫৪৬
	শহর	৩,৪২,৫৩০	১,৯৭,৮৫৫	১,৪৪,৬৭৫
১(খ) গণনাস্থান ব্যতীত জেলার অন্যত্র জন্ম	মোট	৮,৬৯,৪২৭	১,৬৯,৯৭৮	৬,৯৯,৪৪৯
	গ্রাম	৭,৮৩,৩৯৬	১,৪৪,২০০	৬,৩৯,১৯৬
	শহর	৮৬,০৩১	২৫,৭৭৮	৬০,২৫৩
১(গ) অন্য জেলা	মোট	১,৪৪,৯৮৭	৩১,৬১০	১,১৩,৩৭৭
	গ্রাম	১,১৩,৪৭০	২০,২৬০	৯৩,২১০
	শহর	৩১,৫১৭	১১,৩৫০	২০,১৬৭
২। অন্য রাজ্য	মোট	২৫,১৩০	৮,৯১০	১৬,২২০
	গ্রাম	১৫,৫৭০	৪,৪৫০	১১,১২০
	শহর	৯,৫৬০	৪,৪৬০	৫,১০০
নির্বাচিত রাজ্যসমুহ				
ক) অন্ধ্রপ্রদেশ	মোট	১২০	৪০	৮০
	গ্রাম	৭০	২০	৫০
	শহর	৫০	২০	৩০

জন্মস্থান	গণনাস্থান	মোট	পু(ষ	নারী
খ) আসাম	মোট	৫৬০	২৭০	২৯০
	গ্রাম	২০০	৯০	১১০
	শহর	৩৬০	১৮০	১০০
গ) বিহার	মোট	২০,০৮০	৬,৪৮০	১৩,৬০০
	গ্রাম	১৩,৩৬০	৩,৫৮০	৯,৭৮০
	শহর	৬,৭২০	২,৯০০	৩,৮২০
ঘ) গুজরাট	মোট	২১০	১২০	৯০
	গ্রাম	০	০	০
	শহর	২১০	১২০	৯০
ঙ) কেরালা	মোট	১৩০	৮০	৫০
	গ্রাম	৪০	৩০	১০
	শহর	৯০	৫০	৪০
চ) মধ্যপ্রদেশ	মোট	১৯০	৯০	১০০
	গ্রাম	৭০	২০	৫০
	শহর	১২০	৭০	৫০
ছ) মহারাষ্ট্র	মোট	২৪০	১৫০	৯০
	গ্রাম	১৪০	৮০	৬০
	শহর	১০০	৭০	৩০
জ) উড়িষ্যা	মোট	৩৪০	১৯০	১৫০
	গ্রাম	১১০	৬০	৫০
	শহর	২৩০	১৩০	১০০
ঝ) পাঞ্জাব	মোট	১৯০	৫০	১৪০
	গ্রাম	৯০	৩০	৬০
	শহর	১০০	২০	৮০
এ() রাজস্থান	মোট	৭৬০	৩৭০	৩৯০
	গ্রাম	৩৫০	১১০	২৪০
	শহর	৪১০	২৬০	১৫০

জন্মস্থান	গণনাস্থান	মোট	পু(ষ	নারী
ট) তামিলনাড়ু	মোট	১৭০	৩০	১৪০
	গ্রাম	১০০	২০	৮০
	শহর	৭০	১০	৬০
ঠ) ত্রিপুরা	মোট	১৯০	১২০	৭০
	গ্রাম	১০০	৬০	৪০
	শহর	৯০	৬০	৩০
ড) উত্তরপ্রদেশ	মোট	১২৫০	৬৭০	৭৮০
	গ্রাম	৪৭০	২৩০	২৪০
	শহর	৭৮০	৪৪০	৩৪০
ঢ) অন্যান্য রাজ্য	মোট	৭৫০	২৭০	৪৮০
	গ্রাম	৪৭০	১৪০	৩৩০
	শহর	২৮০	১৩০	১৫০
আ) ভারতের বাইরে	মোট	৬৯,৩৯৯	৩৪,৯০৯	৩৪,৪৯০
	গ্রাম	৪৪,৭৪০	২১,৯৭০	২২,৭৭০
	শহর	২৪,৬৫৯	১২,৯৩৯	১১,৭২০
১। এশিয়া	মোট	৬৭,৬৮৯	৩৪,৬২৯	৩৩,০৬০
	গ্রাম	৪৩,১৬০	২১,৭৭০	২১,৩৯০
	শহর	২৪,৫২৯	১২,৮৫৯	১১,৬৭০
ক) বাংলাদেশ	মোট	৬৭,০৭৯	৩৪,৩২৯	৩২,৭৫০
	গ্রাম	৪২,৮০০	২১,৫৯০	২১,২১০
	শহর	২৪,২৭৯	১২,৭৩৯	১১,৫৪০
খ) চীন	মোট	২১০	১১০	১০০
	গ্রাম	১২০	৬০	৬০
	শহর	৯০	৫০	৪০
গ) নেপাল	মোট	১৬০	১০০	৬০
	গ্রাম	৫০	৪০	১০
	শহর	১১০	৬০	৫০

জন্মস্থান	গণনাস্থান	মোট	পু(ষ	নারী
ঘ) এশিয়ার অন্যান্য দেশ	মোট	২৪০	৯০	১৫০
	গ্রাম	১৯০	৮০	১১০
	শহর	৫০	১০	৪০
২। ইউরোপ	মোট	১৭১০	২৮০	১৪৩০
	গ্রাম	১৫৮০	২০০	১৩৮০
	শহর	১৩০	৮০	৫০
ই) অনির্দিষ্ট	মোট	১৫৮০	১৫৩০	৫০
	গ্রাম	১৫৩০	১৫২০	১০
	শহর	৫০	১০	৪০

সূত্র - জনগণনা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ প্রদত্ত তথ্য, সারণী- ডি-১, ১৯৯১

সারণী- ৪.১৩

জেলায় জনাগমের তুলনামূলক চিত্র

(১৯৬১-১৯৯১)

বিষয়	১৯৬১			১৯৯১		
	মোট জনসংখ্যা	শতাংশ	জনাগমের শতাংশ	মোট জনসংখ্যা	শতাংশ	জনাগমের শতাংশ
মোট জনসংখ্যা	২২,৯০,০১০	১০০	-	৪৭,৪০,১৪৯	১০০	-
জনাগম	১,৫৩,৮৮২	৬.৭০	১০০	২,৪১,০৯৬	৫.০৯	১০০
বিদেশাগত	৬৫,০৭৬	২.৮৪	৪২.২৮	৬৯,৩৯৯	১.৪৬	২৮.৭৮
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান	৬৪,৮৬২	২.৮৩	৪২.১৫	৬৭,১৩৯	১.৮১	২৭.৮৪
ভিন রাজ্য থেকে আগত	২০,৫৬৬	০.৮৮	১৩.১৬	২৫,১৩০	০.৫৩	১০.৪২
অন্য জেলা থেকে আগত	৬২,৫৬৯	২.৭৩	৪০.৬৬	১,৪৪,৯৮৭	৩.০৯	৬০.৬৯
বিহার	১৬,৯৮৯	০.৭৪	১১.০৪	২০০.৮০	০.৪২	৮.৩২
উত্তরপ্রদেশ	১,২৬৩	০.০৬	০.৮২	১২৫০	০.০২	০.৫১
গ্রামে বসতি স্থাপনকারী	১,১৮,৩৮৪	৫.১৬	৭৬.৯৩	১,৭৫,৩১০	৩.৭০	৭২.৭১

সূত্র - ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৬১ এবং খসড়া জনগণনা তথ্য, জনগণনা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ, সারণী, ডি-১ ঃ ১৯৯১

সারণী- ৪.১২ ও সারণী- ৪.১৩ থেকে দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের মোট অভিবাসন হয়েছে ২,৪১,০৯৬ জনের। এর মধ্যে ভারতের বাইরের থেকে এসেছেন ৬৯,৩৯৯ জন। ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এ জেলায় এসেছেন ২৫,১৩০ জন। অন্যান্য জেলা থেকে এসে এ জেলায় বসবাস করছেন ১,৪৪,৯৮৭ জন।

বিদেশ থেকে আগত জনসংখ্যার সিংহভাগ (৯৬.৬৬ শতাংশ) এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে এসেছেন ০.৮৮ শতাংশ মানুষ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মুর্শিদাবাদে জনাগমের অনুপাত ২.৪৬ শতাংশ।

ভিন্নরাজ্য থেকে এ জেলায় যে জনাগম তার সিংহভাগ বিহার রাজ্য থেকে ৭৯.৯০ শতাংশ। অন্য রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও আসাম।

১৯৯১ পর্যন্ত জেলার যে জনাগম-চিত্র তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল এই যে, বহিরাগত জনসংখ্যার অধিকাংশই অন্য জেলা বা রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছে এবং এ জেলায় এসে বসবাস করছে গ্রামেই। জেলার বাইরে থেকে এসে এ জেলার গ্রামাঞ্চলে বসবাস করছেন, এমন জনসংখ্যা ১,৭৫,৩১০ জন অর্থাৎ মোট জনাগমের ৭২.৭১ শতাংশ।

১৯৬১ ও ১৯৯১ সালের তুলনামূলক জনাগম-চিত্র দেওয়া হ'ল সারণী- ৪.১৩ তে।

যদি জেলাতে জন্ম কিন্তু জন্মস্থানে বসবাস করে না এমন জনসংখ্যার অভিবাসনকেও বিবেচনার মধ্যে ধরা হয় তবে অন্যরকম চিত্র পাওয়া যায়। এই ধরণের অভিবাসন-সহ মোট অভিবাসনের রাজ্য ও জেলার তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল সারণী- ৪.১৪ -এ।

বিবাহ ও পরিবার

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১০-১৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে বিবাহিতের সংখ্যা ৮,৭০০ । এর মধ্যে বালকের সংখ্যা ১৪১০ এবং বালিকার সংখ্যা ৭২৯০ । ঐ বিবাহিত বালিকাদের মধ্যে ২০ জন ইতিমধ্যেই স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়েছে। ১৪ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে ১০ জন বালক ও ৯০ জন বালিকার।

১৫-১৯ বছর বয়সী বিবাহিতের সংখ্যা ১,০৭,৫০২ জন, যা ঐ বয়সের মোট জনসংখ্যার ২৫.২৪ শতাংশ। এর মধ্যে পু(ষের সংখ্যা ১৪,২৭০ জন এবং নারীর সংখ্যা ৯৩,২৩২ জন। বিধবার সংখ্যা ৮৮০, বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে ১৯০ জন পু(ষ ও ১৭৪০ জন নারীর।

১৯৫১ এবং ১৯৬১ সালের সঙ্গে ১৯৯১ সালের বয়সভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হয়েছে সারণী- ৪.১৫ তে। ১৯৫১ সালে ০-১৪ বছর বয়সী বালক ও বালিকা ছিল যথাত্র(মে ১.৬৮ শতাংশ এবং ১৩.০৫ শতাংশ। ১৯৬১ সালে ঐ দুটি অনুপাত হয় যথাত্র(মে ০.৪২ শতাংশ এবং ৫.৯২ শতাংশ। অর্থাৎ এক দশকে বাল্যবিবাহ অনেকটা কমে। যদিও ১৯৬১ সালের তথ্য হয়ত

সারণী- ৪.১৪

রাজ্য ও জেলার অভিবাসের তুলনামূলক চিত্র (১৯৯১)

	পশ্চিমবঙ্গ			মুর্শিদাবাদ		
জন্মস্থান	মোট	পু(ষ	নারী	মোট	পু(ষ	নারী
পশ্চিমবঙ্গ	১,২৭,১২,৯৯০	২৭,৩৬,৯২৩	৯৯,৭৬,০৬৭	১০,১৪,৪১৪	২,০১,৫৮৮	৮,১২,৮২৬
	(৭১.০৯)	(৪৯.৭৪)	(৮০.৫৯)	(৯১.৪৮)	(৮২.১৪)	(৯৪.১৩)
একই জেলার	৯৯,১৩,৯২৯	১৮,৩৭,২৯৮	৮০,৭৬,৪৩১	৮,৬৯,৪২৭	১,৬৯,৯৭৮	৬,৯৯,৪৪৯
অন্যত্র	(৫৫.৪৪)	(৩৩.৩৯)	(৬৫.২৪)	(৭৮.৪০)	(৬৯.২৬)	(৮১.০০)
অন্য জেলা	২৭,৯৯,২৬১	৮,৯৯,৬২৫	১৮,৯৯,৬৩৯	১,৪৪,৯৮৭	৩১,৬১০	১,১৩,৩৭৭
	(১৫.৬৫)	(১৬.৩৫)	(১৫.৩৫)	(১৩.০৭)	(১২.৮৮)	(১৩.১৩)
ভিন্ন রাজ্য	২০,২৪,১৬৫	১১,০৩,৮২৭	৯,২০,৩৩৮	২৫,১৩০	৮,৯১০	১৬,২২০
	(১১.৩২)	(২০.০৬)	(৭.৪৩)	(২.২৭)	(৩.৬৩)	(১.৮৮)
পররাষ্ট্র	৩১,৪৪,৯৬২	১৬,৬১,৭১৮	১৪,৮৩,২৪৪	৬৯,৩৯৯	৩৪,৯০৯	৩৪,৪৯০
	(১৭.৫৯)	(৩০.২০)	(১১.৯৮)	(৬.২৬)	(১৪.২২)	(৩.৯৯)

সূত্র - সারণী, সি- ১(এ) এবং সি- ১(বি), জনগণনা তথ্য, জনগণনা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ।

সঠিক নয়। কারণ ঐ জনগণনাতে ১০ বছরের কম বয়সের বালক বালিকাদের বৈবাহিক অবস্থা যাই হোক না কেন, সকলকেই অবিবাহিত দেখান হয়েছিল। তিন দশক বাদে দেখা যাচ্ছে বাল্যবিবাহ আরও হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু নির্মূল হয় নি। ১৯৯১ এর জনগণনার তথ্য অনুসারে ০-১৪ বছরের বিবাহিতের শতকরা হার ০.৮৮ শতাংশ।

বাল্যবিবাহ একসময় উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও, এখন একেবারেই নেই। এমন কি আদিবাসী সমাজেও বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। গ্রামাঞ্চলে আজলফদের থেকেও নিচু মর্যাদার মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহের চল আছে। মাল, কোনাই এবং চাঁই, যারা বৈষ(ববাদের আশ্রয়ে হিন্দু হয়েছে, তাদের মধ্যেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত। ঐ সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন হয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের অনুকরণে এবং উচ্চবর্ণগুলি বাল্যবিবাহ ত্যাগ করলেও নিম্নবর্ণীয়েরা এখনও এই প্রথাকে কিছুটা ধরে রেখেছে। (ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, ১৯৭৯)।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৫-৩৪ বছর বয়সী নারীদের ৮০.২২ শতাংশ বিবাহিত। একই বয়ত্র(মের বিবাহিত পু(ষের হার ৪৯.৯৬ শতাংশ। ঐ বয়সের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮২,৬৬০, তার মধ্যে বিবাহিত ১০,২৩,৬১৪ জন, অর্থাৎ ৬৪.৬৮ শতাংশ।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৫-৩৪ , ৩৫-৫৪ এবং ৫৪ উর্দ্ধ বয়ত্র(মে বিধবার হার যথাত্র(মে ১.৬২ শতাংশ, ১৩.৯৯ শতাংশ এবং ৫৬.৮০ শতাংশ। সারণী- ৪.১৫ থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালের তথ্য বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পরের যে অবস্থা তার তুলনায় প্রতিটি বয়ত্র(মেই বিধবার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিই এর পিছনে মূল কারণ।

বিধবা বিবাহের আইনগত কোন বাধা না থাকলেও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের রীতিমাফিক তা এখনও নিষিদ্ধ বললেই চলে। মাল, বাগদি, বাউড়ি, কোনাই, চাঁই ইত্যাদি অন্ত্যজ নামে পরিচিত জনসমাজে একসময় বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল। উচ্চবর্ণের অনুকরণে ঐ সমাজেও বিধবাবিবাহ ত্র(মে অপ্রচলিত হয়ে আসছে। মুসলমান এবং সাঁওতাল বা অন্য উপজাতি সমাজেও বিধবা-বিবাহের প্রচলন নেই।

সারণী- ৪.১৫
বয়সভিত্তিক বৈবাহিক অবস্থার চিত্র - ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৯১

বৎসর	বয়ত্র(মে	অবিবাহিত		বিবাহিত		বিধবা / মৃতদার		বিবাহ-বিচ্ছিন্ন	
		পু(ষ	নারী	পু(ষ	নারী	পু(ষ	নারী	পু(ষ	নারী
১৯৫১	মোট	৫১.৮৬	৩৫.৩১	৪৪.০৮	৪৯.৫৩	৪.০৬	১৫.১৬	-	-
	০-১৪	৯৮.১২	৮৬.৪৪	১.৬৮	১০.০৫	০.২০	০.৫১	-	-
	১৫-৩৪	৩৬.৬২	৪.৯৭	৬১.২২	৮৬.৭৯	২.১৬	৮.২৪	-	-
	৩৫-৫৪	১.৮৭	০.৩৪	৮৯.৮২	৬৩.৪৫	৮.৩১	৩৬.২১	-	-
	৫৫- উর্ধ	০.৭৭	০.৪৭	৭৪.৮৪	২৬.১৬	২৪.৩৯	৭৩.৩৭	-	-
১৯৬১	মোট	৫৭.৭৯	৪৪.৯১	৩৯.৬৫	৪১.৭৫	২.১৪	১২.৬২	০.৪২	০.৭২
	০-১৪	৯৯.৫৪	৯৩.৯০	০.৪২	৫.৯২	০	০.০৪	০.০৪	০.১৪
	১৫-৩৪	৩৮.৬৯	৪.৬২	৫৯.৮৮	৯০.৩২	০.৭১	৩.৭৫	০.৭২	১.৩১
	৩৫-৫৪	১.৮৩	০.৬২	৯৩.০৪	৬৪.৪৮	৪.৪০	৩৩.৯২	০.৭৩	০.৯৮
	৫৫- উর্ধ	১.৫৪	০.৬৮	৮০.৭৮	২০.৭৬	১৬.৮১	৭৭.১৮	০.৮৭	১.৩৮
১৯৯১	মোট	৫৯.১৬	৪৮.২৪	৩৯.৯১	৪৩.৯১	০.৭৭	৭.১০	০.১৫	০.৭৫
	১-১৪	৯৯.৮৫	৯৯.২৪	০.১৪	০.৭৪	০.০১	০	০	০.০২
	১৫.৩৪	৪৯.৬১	১৬.৬৬	৪৯.৯৬	৮০.২২	০.২২	১৪.৬২	০.২১	১.৫০
	৩৫-৫৪	২.৬৭	০.৬২	৯৬.০২	৮৪.১৪	১.০৫	১৩.৯৯	০.২৬	১.২৫
	৫৫- উর্ধ	২.১৭	০.৭৬	৯০.১৩	৪১.৭৬	৭.২৭	৫৬.৮০	০.৪৩	০.৬৮

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

ধর্মীয় সম্প্রদায়

ধর্ম শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকলেও ধর্ম বা religion বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মসমূহের পার্থক্য নির্ণয়। তাই এগুলিকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ও বলা যায়। /বিশেষ বিশেষ পূজা, উপাসনা বা জীবনযাত্রার পদ্ধতি সাম্প্রদায়িক ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ..... সাম্প্রদায়িক ধর্মের সহিত সমাজ বা গোষ্ঠীজীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। (কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, ভারতকোষ)।

যুগে যুগে কত আবর্তন-বিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সব ধর্ম চলছে। /ধর্মকর্মের বিবর্তন-ইতিহাসের ভিতর দিয়াও সেইজন্য জনসাধারণের জীবনের এবং সমাজবিন্যাসের ইতিহাস উজ্জ্বলতর হয়। (নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস)।

দেশের সমস্ত নাগরিক জন্মসূত্রে কোনও না কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত(। এ দেশের প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন-শিখ এবং খ্রীষ্টান, এছাড়া আদমশুমারির ভাষায় যাঁদের বলা হয় Animist— সর্বজীববাদী, সেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে।

ভারতে প্রথম লোকগণনা চালু হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ গণনার হিসাব অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, মুর্শিদাবাদ জেলাতে মুসলমান জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ জেলার তৎকালীন মোট জনসংখ্যার ৭,১৩,১৫২ বা শতকরা ৫২ ভাগ মুসলমান এবং ৬,৪৩,২৯১ বা শতাংশ ৪৭ ভাগ হিন্দু। এছাড়া যাঁদের Animist ধরা হচ্ছে তাঁদের মোট সংখ্যা ১৪,৪১৯ জন। (বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, ওম্যালি, ১৯১৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপে(া বেশি ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার প্রতিবেদন ও পরিসংখ্যানে পাওয়া যাচ্ছে— মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জনসংখ্যা ১২,২৬,৭৯০ জন। তার মধ্যে ৬,৩৪,৭৯৬ জন বা ৫১.৭৪ শতাংশ হিন্দু এবং ৫,৮৯,৯৫৭ জন বা ৪৮.০৮ শতাংশ মুসলমান। সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

ওম্যালি-র বিবরণ থেকে একটি জ(রি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রধানত সাঁওতাল পরগণা থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, কোড়া প্রভৃতি এসে সাগরদীঘি, নবগ্রাম-মীর্জাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। গেজেটিয়ারের তথ্য, সে সময়ের ১০৮৪৭ জন সাঁওতালের মধ্যে ৩৫৪৬ জন নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছেন। হিসাবটা এইরকম ঃ ১৬১৯ জনের মধ্যে ৯৮৮ জন ওরাঁও, ৩১৭ জনের মধ্যে ১৯৪ জন মুন্ডা এবং কিছু কোড়া নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেছেন।

এই হিসাবের নিরিখে মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ছিল(কিন্তু তা হয়নি। বিশ শতকে মুসলমান জনসংখ্যা ত্র(মবর্ধমান এবং তা হিন্দু জনসংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়ে ত্র(মে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। 'পপুলেশন বাই রিলিজিয়ন ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ' অনুযায়ী নিচের সারণী দেখলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণী- ৪.১৬

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার শতকরা পরিবর্তন (শতকরা হিসাবে)

সাল	মুসলমান	হিন্দু
১৯০১	৫০.৭৩	৪৩.০০
১৯৩১	৫৫.২৪	৪৪.০৮
১৯৫১	৫৫.২২	৪৪.০৮
১৯৬১	৫৫.৩৩	৪৩.৪৬
১৯৭১	৫৬.৩৩	৪৩.৪৬
১৯৮১	৫৮.৬৭	৪১.১৫
১৯৯১	৬১.৪০	৩৮.৩৯

সূত্র ঃ সেন্সাস অব্ ইন্ডিয়া

দেশ বিভাগের ফলে কিছু মুসলমান অন্যত্র বা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যান। অন্যদিকে অবিরত বহু হিন্দু পূর্বপাকিস্তান থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসতে থাকেন। সে কারণে দেখা যাচ্ছে, অতি সামান্য হলেও, হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে। ১৯৮১ থেকে পরবর্তী সময়ে দেখা যাচ্ছে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃদ্ধির হারে পার্থক্য অনেক বেশী। পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রাচীন ধর্মীয় বিন্যাস ত্র(মশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুসমাজ বহুদিন ধরে নানা জাতির সং(-যে গঠিত এবং পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ধর্মের ভূমিকা ভিন্নতর এবং ভারতে জনগণনা ২০০১ নির্দেশাবলীতে গণনাকারীর প্রতি নির্দেশ

সারণী - ৪.১৭

হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার ব্লকভিত্তিক চিত্র (১৯৮১-১৯৯১)

		হিন্দু (শতাংশ হিসাবে)		মুসলমান (শতাংশ হিসাবে)	
		১৯৮১	১৯৯১	১৯৮১	১৯৯১
(১)	ফরাক্কা	৪১.১৩	৪০.৩৬	৫৮.৭২	৬৯.৩৪
(২)	সামশেরগঞ্জ	২২.৪৫	১৯.৩৯	৭৭.৫২	৮০.৬১
(৩)	সুতি - ১	৪১.৬৯	৩৯.০২	৫৭.৯৫	৬০.৯২
(৪)	সুতি - ২				
(৫)	রঘুনাথগঞ্জ-১	৩৫.৩৯	৩৩.২০	৬৪.৫১	৬৬.৭২
(৬)	রঘুনাথগঞ্জ-২				
(৭)	সাগরদীঘি	৪১.৬৯	৩৯.১৮	৫৭.৪৬	৫৯.৭৫
(৮)	লালগোলা	২৬.৬৮	২৪.১৩	৭৩.১৬	৭৫.০৪
(৯)	ভগবানগোলা-১	২১.৮২	১৭.৯৮	৭৮.১৮	৮২.০২
(১০)	ভগবানগোলা-২				
(১১)	রাণীনগর - ১	২৩.৮৬	২১.২২	৭৬.১২	৭৮.৭৭
(১২)	রাণীনগর - ২				
(১৩)	মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	৪৮.৫৬	৪৬.৯১	৫১.০৩	৫২.২৮
(১৪)	নবগ্রাম	৫২.৪৫	৫০.১৫	৪৬.৯১	৪৮.৫৩
(১৫)	খড়গ্রাম	৫৫.০৩	৫২.৩৬	৪৪.৯৭	৪৭.৩১
(১৬)	বড়এ(া	৬৪.১৬	৩৫.৭৪	৬১.৫০	৩৮.৪৫
(১৭)	কান্দী	৪৭.৯৭	৪৪.৭১	৫১.৯৪	৫৫.১৪
(১৮)	ভরতপুর - ১	৫১.৭২	৪৮.০৬	৪৮.২৬	৫১.৯৩
(১৯)	ভরতপুর - ২				
(২০)	বেলডাঙ্গা - ১	৩৮.৯০	৩৫.৩৪	৬১.১০	৬৪.৬৫
(২১)	বেলডাঙ্গা - ২				
(২২)	নওদা	৩৬.৯৫	৬৩.০৪	৩৩.৫৪	৬৬.৪৬
(২৩)	হরিহরপাড়া	২৫.৮৫	৭৪.১৫	২৩.৯৫	৭৬.৬৫
(২৪)	বহরমপুর	৪৭.৭৯	৫২.১১	৪৭.৪৪	৫২.৪৫
(২৫)	ডোমকল	১৩.৫৭	৮৬.৪২	১২.৭২	৮৭.২৪
(২৬)	জলঙ্গী	৩৬.৬১	৬৩.৩৭	৩৪.৮৪	৬৮.১৬

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক, ২০০১

আছে, 'যদি কোন ব্যক্তি(বলেন যে তিনি কোন ধর্মাবলম্বী নন, লিখুন ধর্ম নেই। .... পরিবারের সব সদস্যই একই ধর্মাবলম্বী হবেন তা না হতেও পারেন। .... জাতের সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে ফেলবেন না। .... অনুগ্রহ করে মনে রাখুন যে একটি পরিবারে পরিবারের কিছু সদস্য তপসিলী জাতি বা উপজাতি হতে পারেন এবং বাকিরা নাও হতে পারেন।' (৫৭ পৃঃ)।

মুসলমান সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের বাধ্যবাধকতা অধিক, শরিয়তের বিধান অবশ্যই মানতে হয়(যদিও দশের বিচার বা পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আগের মত নেই।

ওম্যালি জানাচ্ছেন, একমাত্র নবাব বাহাদুরের পরিবার সিয়া, তা ছাড়া জেলায় প্রায় সমস্ত মুর্শিদাবাদ সুন্নি এবং হানাফি মতাবলম্বী। ১৯৭৯ মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ারের বিবরণ অনুসারে এ জেলার মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণী, যাদের নাকি জায়গীরদারী ছিল এবং মধ্যযুগীয় আয়মাদারি অধিকার ছিল, তারা তুর্কী, আফগান, বা আরব-পারস্য থেকে আসা অভিজাত আসরাফ মুসলমান। বাকি সব নিম্নবর্গের ধর্মান্তরিত হিন্দু থেকে আলতাফ বা অনভিজাত মুসলমান। সাধারণ মুসলমানরা শেখ বলে পরিচিত, প্রধানত কৃষক ও কৃষিজীবী। শেখরা আবার মুসলমান তাঁতি বা জোলা সম্প্রদায়কে এবং মৎস্যজীবী মহলদার শ্রেণীকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। আসরাফগণ ধনী জোতদার জমিদার। শি(া প্রসারের ফলে এখন মুক্ত(মাদ্রাসার শি(া ছেড়ে সাধারণ শি(ার প্রতি বেশী আকৃষ্ট এবং হোয়াইট কলার জব-এর প্রতি ঝুঁকছেন। নানা সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাবে সাম্য ও ঐক্যের উপাদান প্রত্য(ভাবে ক্রি(য়াশীল।

এই সারণীটি পর্যবে(ণ করলে দেখা যাবে কয়েকটি ব্লক ব্যতিত্র(ম মাত্র। কেবল হিন্দু-মুসলমান নয়, অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একটি হদিশও মিলছে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা থেকে। তখন মুর্শিদাবাদ জেলায় ৯৭৫ জন জৈন, ৪১৩ জন খ্রীষ্টান, ১৫ জন ব্রাহ্ম, ৫ জন বৌদ্ধ ২ জন ইহুদি, ১ জন পারসি ও ১ জন শিখ ছিলেন (ওম্যালি)।

পরবর্তী সময়ে তাঁদের হ্রাসবৃদ্ধির একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে সারণী- ৪.১৮ তে।

প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যা বাড়ছে। কারণ হিসাবে বলা যায়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পাশাপাশি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে আর্থসামাজিক আকর্ষণে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রবণতা। এ জেলায় বেশ কয়েকটি খ্রীষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান সক্রি(য় এবং তার বিদ্যালয় চালাচ্ছেন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়।

সারণী- ৪.১৮

অন্যান্য ধর্মের জনসংখ্যার চিত্র (১৯৭১-৯১)

ধর্মাবলম্বী	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
খ্রীষ্টান	৩০১৩ (০.১০ %)	৩৭৬০ (০.১০ %)	৬৮৩২ (০.৪ %)
শিখ	৩০৫ (০.০০ %)	৩৯৯ (০.০০ %)	২৬১ (০.০০ %)
বৌদ্ধ	৪২ (০.০০ %)	৮১ (০.০০ %)	৬৯ (০.০০ %)
জৈন	২৪৭২ (০.০৮ %)	২৬৯৬ (০.০৮ %)	২৯৭৭ (০.০৫ %)

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৭১,১৯৮১,১৯৯১

বহিরাগত জৈনগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় সেই জগৎশেঠের আমল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিত্তবান এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী শ্রেণী। বর্তমানে জৈনদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্য ছাড়াও তাঁরা শি(াগ্রহণের দিকে ঝুঁকেছেন এবং 'হোয়াইট কলার জব' মসীজীবী হচ্ছেন তাঁদের যুবকগণ। 'জৈন সম্প্রদায়ের সামাজিক কাজকর্ম বি(েষণ করলে যে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে তা হ'ল— (১) দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা একদিকে যেমন শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন, তেমনি অনেক(ত্রে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন, (২) অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের অবস্থান ও অন্য দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (হিন্দু ও মুসলমান) তুলনায় সংখ্যাগত স্বল্পতা থাকলেও ব্যবসায়ের ((ত্রে প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন ' (ডঃ কিশোরকুমার রায়চৌধুরী)।

বর্ণ ও জাতি

ধর্মের সঙ্গে বৃত্তির মেলবন্ধন সুপ্রাচীন। বৈদিক যুগে চারি বর্ণের বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকলেও তা অতি কঠোরভাবে পালিত হত না। পরবর্তী সময়ে মনু যে অনুশাসন প্রবর্তন করেন তা অত্যন্ত কঠোররূপে পালনীয় হয়। বৃত্তিত্যাগ অমার্জনীয় এবং বৃত্তিপরিচয়েই বর্ণের বা জাতির সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হতে থাকে।

বৈদিক যুগের চার বর্ণের চতুর্থবর্ণ শূদ্র, যারা উচ্চ বর্ণের সেবা করবেন। দস্যু-দাস-চণ্ডাল এই সব পরিচয় থেকে কালক্র(মে শূদ্র বর্ণের কাজের নানা বিভাগ নির্দিষ্ট করে, অত্রিসংহিতা মতে— রজক, চর্মকার, নট, ব(ড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল--এই সপ্ত হীনজাতি সৃষ্টি করা হয়। যারা অন্ত্যজ। পরাশর সংহিতায় উল্লেখ—

গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বা(জী
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ।

অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের তথা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে কায়িক শ্রম ও কা(শিল্পের নিযুক্তি(কেই বৃত্তি ধরে জাতি নির্ণয় করা হল। এরা অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য হলেও এরা বৃত্তি ত্যাগ করলে সমাজ অচল হয়ে যাবে। তাই বৃত্তি ত্যাগ কখনই করা যাবে না। যদিও মনু আপর্দ্ধনের বিশদ বিধান দিয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে বৃত্তি ত্যাগ করলে সময়ান্তরে প্রায়শ্চিত্ত করে পূর্ববৃত্তি ও জাতি র(া করা যাবে বলেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে নৈয়ায়িক রঘুনন্দন শূদ্রদের (ে ত্রে আরও কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন।

'যে সকল জাতির কৌলিক বৃত্তির সহিত মানুষ বা পশুর মৃতদেহ অথবা দেহ হইতে নির্গত রক্ত(, মল-মূত্রাদির সম্পর্ক আছে তাহারা অত্যন্ত অর্বাচীন কাল হইতে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইতে থাকে (নির্মল কুমার বসু)।' ত্র(মে অস্পৃশ্যতা নিষ্ঠুর বিধানে পরিণত হয়, যার পরিণামে জাতিভেদ প্রথা ও অনৈক্যে হিন্দুসমাজের সংহতি নষ্ট হতে থাকে।

এদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন সমাজে কতকগুলি অনিবার্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। 'মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ (মতা অনেকাংশে হারাইয়া বসে, কারণ রাজশক্তি(যাহাদের আয়ত্তে তাহারা প্রতিযোগিতাবিহীন, কুলগত-বৃত্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় বি(োসী নহে। পরবর্তীকালে ইংরেজদের শাসনকালে এবং বিদেশী শক্তি(র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতামূলক এক নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কলকারখানায় নির্মাণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রকৃতিতে আমূল পরিবর্তন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি(ত্ব বিকাশের সহায়ক পাশ্চাত্য শি(া বিস্তারের ফলে প্রাচীন জাতিগত বৃত্তি অনুসরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ আর সম্ভব হইতেছে না' (নির্মল কুমার বসু)।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারে দেখা যাচ্ছে বাংলার উপার্জনশীল ব্রাহ্মণদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৪.৫৭ জন স্ববৃত্তি, যজনযাজন কর্মে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু বা(জীবী বা পানের চাষী ও ব্যবসায়ী ৪৪.১৫ শতাংশ এবং কুম্ভকারদের মধ্যে ৬১.৬৯ শতাংশ তখনও স্ববৃত্তি আশ্রয় করে ছিলেন। গ্রাম ও শহরে বৃত্তি বা জীবিকা বৈষম্য থেকে ধনবৈষম্য ও মর্যাদা বৈষম্য বৃদ্ধি সমাজবন্ধন শিথিল করে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আদমশুমারী কমিশনার স্যার হার্বার্ট রিজলি অনুন্নত সম্প্রদায় ও জাতিকে শ্রেণীভুক্ত(করার কাজ শু(করেন। তাতে ধর্মীয় বিন্যাস রূপান্তরিত হয়ে গেল, হিন্দু থেকে নির্বাচিত হলেন যে শ্রেণীগুলি তারা হলেন তপ সিলী জাতি আর অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা হলেন তপসিলী উপজাতি। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা প্রথার কারণে এবং প্রধানত সামাজিক, শি(াগত ও অর্থনৈতিক অবনয়নের ফলে এই এক ধরণের জাতি বিন্যাস সম্ভব হ'ল।

'১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে 'তপসিল ভুক্ত(জাতি' কথাটি প্রথম পাওয়া যায়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তদানীন্তন আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, মাদ্রাজ, ওড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত(প্রদেশের কতিপয় জাতি, কুল ও উপজাতিকে তপসিলভুক্ত(জাতি বলিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ..... আদেশ জারি করেন। ইহার পূর্বে এই সকল জাতিকে সাধারণতঃ অনুন্নত সম্প্রদায় বলা হইত' (নির্মল কুমার বসু)।

১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান দশটি তপসিলী জাতি ও দশটি তপসিলী উপজাতির জনসংখ্যা কত তার হিসেব সারণী- ৪.১৯ এ দেওয়া হ'ল। ল(ণীয় সবচেয়ে বেশি সাঁওতাল ৬৩.৩১% আর সবচেয়ে কম ভুটিয়া মাত্র ০.০২ % তপঃ উপজাতির মধ্যে।

১৯৭১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির জনসংখ্যার থানা ভিত্তিক চিত্র দেওয়া হ'ল সারণী- ৪.২০ এ (পৃষ্ঠা ১৮৮ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯১ সালের জনগণনার অনুসারে তপশীলভুক্ত(জাতি ও উপজাতির ব্লকভিত্তিক চিত্র দেওয়া হ'ল সারণী- ৪.২১ এ।

বাগদি ঃ বাগদিদের অন্ত্যজ বলা হ'ত। মুর্শিদাবাদ জেলায় বাগদি সংখ্যায় অনেক। মাছধরা, প্রান্তিক কৃষি ও দিন মজুরী এদের পেশা। রিজলি এদের সনাক্ত(করেছেন দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর উত্তরপু(ষ হিসাবে। এখন গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী জীবিকার সন্ধানে। বাগদিদের কোথাও কোথাও 'দুলে' বলা হয়। বাগদি সমাজে হিন্দুভবন ঘটেছে খুব দ্রুত। এখন বিবাহ বিচ্ছেদ, যা একদা এ সমাজে অহরহ ঘটত তার সংখ্যাও কমে এসেছে।। শিব, কালী, ধর্মরাজ ও মনসা— বাগদিদের ধর্মানুষ্ঠানে এদেরই প্রাধান্য বেশী। এছাড়া আছে ভাদু।

চর্মকার ঃ চর্মকার বা মুচিদের জাত ব্যবসা জুতো তৈরীর জন্য ও মৃদঙ্গ, ঢোল, তবলা ইত্যাদি ছাওয়ার জন্য চামড়া প্রস্তুত করা। মহিলারা ধাত্রী, ধাই বা দাইয়ের কাজ করতেন। কিন্তু এই অন্ত্যজ শ্রেণী বলে কথিত চামারদের নিজ বৃত্তি আর নেই বলা চলে। পশুচর্ম ব্যবহার কমেছে, কৃত্রিম চামড়া leatherette ব্যবহার দ্রুত বেড়েছে। প্রসূতিসদনে শিশু জন্মের ব্যবস্থার ফলে ধাই বা দাইদের আর ডাক পড়ে না।

জনগণনায় এদের অভিহিত করা হয় নানা নামে—চামার, চর্মকার, মুচি, রবিদাস, (ইদাস, ঋষি ইত্যাদি। গ্রামে-গঞ্জে উৎসবে

সারণী - ৪.১৯

জেলার প্রধান তপসিলী জাতি ও উপজাতির জনসংখ্যা

তপসিলী জাতি			তপসিলী উপজাতি		
(১)	রাজবংশী	৭২৫১৩	(১)	সাঁওতাল	৩৮৯৪১
(২)	নমশূদ্র	৫৩৫৮৯	(২)	ওরাঁও	৬৮৯০
(৩)	বাগদি দুলে	৯৪১৬৩	(৩)	মুণ্ডা	১৯৪৩
(৪)	পোদ বা পুণ্ড্র	৩৯৪৩৭	(৪)	ভূমিজ	২৬৮
(৫)	বাউড়ি	৬৩০৯	(৫)	কোড়া	৫৫৪
(৬)	চামার	৭৭২১৮	(৬)	লোধা	১৬
(৭)	জেলে	১৪৪৭৮	(৭)	মাহালি	৬৩১
(৮)	হাড়ি, মেথর	১৮৭১০	(৮)	ভূটিয়া	১৩
(৯)	ধোপা	৮০৬০	(৯)	বেদে	১১৮৯
(১০)	শুঁড়ি	১২৫৫৮	(১০)	শবর	২৫

সূত্র ঃ স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল, ডিরেক্টর অব্ সেন্সাস অপারেশনস্- ২০০০

ঢাকঢোল বাজাতে এদের ডাক পড়ে। কোন কোন গোষ্ঠীর পেশা আবার বাঁশের কাজ ও ঝুড়ি বোনা। পঞ্চাশের দশকেও এ সমাজে বাল্যবিবাহের কেবল প্রচলন ছিল তা নয়, বিশেষ গু(ত্বও ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার পুনর্বিবাহ ছিল স্বীকৃত। হিন্দুধর্মের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথা অনেকটাই লোপ পেয়েছে। এই সম্প্রদায়ের একটা অংশ বৈষ(ব ধর্মে বি(াসী। তুলসী ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিটি পরিবারে আরাধ্য। কালী, দুর্গা ও গোপীনাথ এদের গ্রামদেবতা। মাঘের শ্রীপঞ্চমী ও আ(িন মাসের নবমী তিথিতে দেবীপুজা এ সমাজের বিশেষ অঙ্গ। শি(ার হার ত্র(মবর্ধমান। জাতিগত জীবিকাতে অন্নসংস্থান কঠিনতর হওয়ায় বৃত্তিগত বৈচিত্রও এসেছে। প্রান্তিক কৃষিকাজ, ভাগচাষ, (ে তমজুরীর পাশাপাশি ব্যবসা এমন কি চাকুরিজীবির সংখ্যাও এখন কম নয়।

রজক বা ধোপা ঃ নবশাখ শ্রেণীর এই জাতিও আজ স্ববৃত্তিচ্যুত। লন্ড্রি ও ওয়াশিং মেসিনের কল্যাণে এখন কাপড় ধোয়ার কাজে একমাত্র ধোপা জাতির লোকেরাই নিযুক্ত(নয় এবং অসম প্রতিযোগিতায় এদের বৃত্তি নাশ হয়েছে। যাদের আর্থিক সঙ্গতি নেই তাঁরা এখন দিনমজুর বা ছোটখাট ব্যবসায়ী।

রিজলি বাংলার ধোপাদের ১৮টি উপবিভাগ সনাক্ত(করেছিলেন। তার মধ্যে মধ্যবঙ্গে, যার অংশ মুর্শিদাবাদ, চারটি উপবিভাগ দেখা যায়। একসময় এ সমাজে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিধবা বিবাহ স্বীকৃত ছিল না। বিবাহ বিচ্ছেদও বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীকৃত ছিল না। তবে বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলাদের পুনর্বিবাহের অধিকার ছিল। রিজলি দেখেছিলেন, মুর্শিদাবাদে ধোপাদের ‘সমাজ’-এ তিন ধরণের কর্মকর্তা ছিল— পরামাণিক, বারিক এবং মন্ডল। বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের পরামর্শ নিতে হ’ত এবং সম্পর্ক নিয়ে কোন প্র(় উঠলে তারাই সিদ্ধান্ত নিতেন।

গোপ বা গোয়ালা ঃ এরা মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। হান্টার যখন ‘এ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল’ সংকলন করেন তখন এরা ছিলেন দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি। কৃষিকাজ ছাড়া প্রধান জীবিকা গোপালন ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিত্রি(করা। এদের মধ্যে দুটি শাখা সুস্পষ্ট, এদেশীয় গোয়ালা এবং উত্তরভারত থেকে আগত গোয়ালা। দ্বিতীয় শাখা, যাদের খোট্টা গোয়ালা বলে, বিবাহাদি কর্মে অবাঙালী লোকাচার পালন করেন। সাধারণ পরিচয় ‘ঘোষ’ হলেও এক সময় নিজেদের ‘যাদব’ অর্থাৎ যদুর বংশধর বলতেন।

রিজলির মতে এরা অনার্য পশুপালক যাযাবর জাতি, যারা উত্তর পশ্চিম ভারত থেকে ত্র(মে মধ্য ও পূর্বভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এরা নারী পু(ষ উভয়েই কঠোর পরিশ্রমী। বাল্যবিবাহ

ও পণপ্রথা এ সমাজে প্রচলিত। এখন বাল্যবিবাহ কমেছে। ধর্মে এরা মূলত বৈষ(ব। জন্মাষ্টমী প্রধান উৎসব।

সদগোপ ঃ এদেরকে নবশাখ ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মাঝামাঝি বলে মনে করা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এদের যজনযাজন করেন বলে এরা নিজেদের উচ্চশ্রেণীর বলে দাবি করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় সদগোপরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কৃষিজীবী ও জমির মালিক।

শুঁড়ি ঃ শুঁড়ি শব্দটি তৎসম শৌন্ডিক থেকে উদ্ভুত। শব্দটির অর্থ মদবিত্রে(তা। শুঁড়িদের মধ্যে যারা সাহা পদবীধারী তারা কখনও সমাজে অস্পৃশ্য ছিল না। ১৯৩১-এর সেন্সাস অব বেঙ্গলে লেখা হচ্ছে, 'Sahas are traders and sunris are traditionally distillers and sellers of wine.'। মদ তৈরী ও বিপণন ঐতিহ্যগত পেশা হলেও শুঁড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত(মানুষের সংখ্যা নগণ্য। অর্থনৈতিক ও শি(াগত দিক থেকে এটি এখন অগ্রগণ্য একটি সম্প্রদায়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এ সমাজে এককালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাগতভাবে নিষিদ্ধ। ধর্মের দিক থেকে এরা চৈতন্যের অনুগামী বৈষ(ব। গণেশ, গন্ধে(শ্বরী ও দুর্গার পুজা এসমাজেও প্রচলিত।

বাউড়ি ঃ প্রান্তিক কৃষিকাজ, মাটিকাটা ও অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে বাউড়িরা জীবিকা অর্জন করে, রিজলির মতে, এরা অনার্য, কিন্তু এখনকার কোন বিশেষ জাতির সঙ্গে এদের নৃতাত্ত্বিক সম্পর্ক নেই। বাগদিদের মত বাউড়ি সমাজেও হিন্দু আচার ভালভাবে প্রবেশ করেছে। মৃত স্বামীর ছোট ভাই বা স্ত্রীর ছোট বোনকে বিবাহের রীতি এসমাজে প্রচলিত। শীতলা, মনসা ও ধর্মরাজের পূজা এদের বড় উৎসব।

ডোম ঃ ডোম জাতিকে রিজলি চিহ্নি(ত করেছেন দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে। ডোমদের বিভিন্ন উপগোষ্ঠী আছে। উপগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ, বিধবা-বিবাহ একসময় এ সমাজে ভালভাবে প্রচলিত ছিল। এরা অনেকে বৈষ(ব। রাধা ও কৃষ(ছাড়াও ধর্মরাজ, ভাদু, কালোবীর ও কালীর পূজা প্রচলিত। ধর্মানুষ্ঠানে ডোম সমাজেরই ধর্মপন্ডিত পৌরোহিত্য করেন। ময়লা পরিস্কার ও শবদাহ এদের জাতিগত জীবিকা। ঝুড়ি ও মাদুর বোনার কাজও এরা করে। বাজুনে ডোমেরা উৎসবে বাজনা বাজাবার কাজ করে। এছাড়া প্রান্তিক কৃষি, ভাগচাষ ও (ে তমজুরীও জীবিকা অর্জনের উপায়।

কোনাই ঃ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে কোনাই জাতির বাস। এ জেলাতে কোনাই জাতির জনসংখ্যা বিপুল। সাধারণত সংঘবদ্ধভাবে বাস করতে ভালবাসে। মূল জীবিকা কৃষি, মৎসচাষ, (ে তমজুরী। একটি অংশ ঢাক বাজানোর কাজও করে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেকের কপালে সবুজ রঙের 'রাখাল ফোটা' দেখা যায়। পণপ্রথা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনর্বির্বাহ ও বিধবা-বিবাহ এ সমাজে প্রথাসিদ্ধ। ব্যবহৃত পদবী কোনাই, মন্ডল ও দাস। নৃতাত্ত্বিক বিচারে এরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীভূক্ত(। দুটি উপবিভাগ আছে— বড় কোনাই, ও ছোট কোনাই। পেশা বা বৃত্তিগত বিভাজন চারটি— চাষী কোনাই, ঢাকী কোনাই, জেলে কোনাই ও তাঁতী কোনাই।

হাড়ি ঃ ঐতিহ্যগতভাবে হাড়িরা মাটির হাড়ি বা পাত্র, যা সৎকারে ব্যবহৃত হয়, তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করত। ময়লা পরিস্কার ও বহনও এদের জাতিবৃত্তি ছিল। উপজীবিকাগত দিক থেকে এরা কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত(। যেমন, মিহতার সম্প্রদায় মালবহন করত, বড় ভাগিয়া সম্প্রদায় পাহারাদারি, চৌকিদারি, পালকীবহন ও বাজনদারের কাজ করত। খোরে সম্প্রদায় শূকর পালন করত, শিউলিরা খেজুর ও তালগাছের রস কাটার কাজ করত—এরকম। এক গোষ্ঠীর সাথে অন্য গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রচলিত। ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনার জন্য হাড়ি সমাজে 'পন্ডিত' নামে এক শ্রেণীর পুরোহিত আছে। তবে জাতিচুত্য ব্রাহ্মণেরাও এ সমাজে পৌরোহিত্য করে। হরিজন, সর্দার, হাড়ি, দাস, হাজরা ইত্যাদি পদবী এ সম্প্রদায় ব্যবহার করে। কালী, মঙ্গলচন্ডী ও শীতলার পূজা হাড়ি সমাজেও বিশেষভাবে প্রচলিত।

মাল ঃ রিজলির মতে মাল জাতি দ্রাবিড়দের বংশধর। ১৮৭২ -এর জনগণনা প্রতিবেদনে রেভারলি মন্তব্য করেছিলেন মাল, মাল-পাহাড়িয়া এবং ওঁরাও এরা একই নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত। মালদের একটা অংশ আবার চন্ডাল ও নমশুদ্র জাতির অংশ হয়ে গেছে, রেভারলি এমন মন্তব্যও করেছিলেন। মালভূমি এবং মালদহ নামের উৎসও মাল জাতি—কোন কোন নৃতাত্ত্বিকের এই অভিমত। মালদের পেশাগত বিভাজনগুলি হল রাজবংশী, ছত্রধারী, বেদে, ধানগুড়িয়া ইত্যাদি। মাল সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের হাড়ি ডোম ও মুচিদের থেকে উচ্চবর্ণের মনে করেন। বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ প্রচলিত। মনসা পূজার প্রচলন এ সমাজে সর্বাধিক। মাল সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ভূমিহীন। দিনমজুরীর পাশাপাশি প্রান্তিক কৃষি, ভাগচাষ, মাছধরা প্রভৃতিও জীবিকা অর্জনের উপায়।

চাঁই ঃ এটি মধ্যভারত থেকে আসা এক আদিম জনজাতি। এখন পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর ও দ(ণ দিনাজপুর জেলায় চাঁই জনজাতি বাস করে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের জনগণনায় মুর্শিদাবাদে এদের সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে ২৬,১৩৩ ও ২০,৬৪৯। নদীর তীরে এবং চরে চাঁইরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। কৌম গোষ্ঠীজীবন থেকে এরা এখনও সরে আসেনি। এখনও শহরবিমুখ গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীজীবন যাপন করে। সমাজের অন্য অংশের মানুষের সঙ্গে মিলিতভাবে বসতি গড়ে না। চাঁই গোষ্ঠীর কয়েকটি পরিবার-ই একসঙ্গে পাড়া বা গ্রাম পত্তন করে বাস করে।

খয়ের উৎপাদন, শনের চাষ এবং দড়ি তৈরীতে চাঁইদের দ(তা সহজাত। বাজারে শাকসব্জী, ডাল, বড়ি ইত্যাদি বিত্রি(অনেকেরই পেশা। এ(ত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মত। চাঁইদের একাংশ মৎস্যজীবি। আবার অনেকেই বৃত্তিচ্যুত হয়ে কৃষিকাজ করে।

মুর্শিদাবাদের চাঁইরা মৈথিলী কথ্য অপভ্রংশের সঙ্গে জঙ্গীপুর মালদহের আঞ্চলিক কথ্যভাষার মিশ্রণে তৈরী এক সংকর ভাষায় কথা বলেন। বাংলা কথ্য ভাষাতেও তারা সাবলীল। চাঁই সমাজের ভাষা ও কৃষি স্বাত্যন্ত্র বজায় রাখলেও মুর্শিদাবাদে বাঙালির পূজোপার্বন-লোকাচার তাঁরা মান্য করেন। চাঁই সমাজে মাতৃপ্রাধান্য ও নারী স্বাধীনতা আছে। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত। বিধবাবিবাহ স্বীকৃত, গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ এখনও নিষিদ্ধ।

জেলে-কৈবর্ত ঃ বাংলায় মাছ ধরা যাদের পেশা তাদের সকলকেই সাধারণভাবে জেলে বলা হয়। সম্ভবত জাল শব্দটি জেলে শব্দের উৎস। সঠিকভাবে বললে এটিকে জাতিনাম বলা যায় না। মালো, তিওড়, কৈবর্ত, রাজবংশী, বাগদি, বাউড়ি এমন কি মুসলমানেরাও জেলে নামে পরিচিত হন। মুর্শিদাবাদে প্রচলিত জেলে-কৈবর্ত নামটি জাতিনামবাচক। রিজলির মতে যে কৈবর্তরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুত্ত(তাদের থেকে মাছ ধরার কাজে নিযুত্ত(কৈবর্তদের পৃথক করা হয়েছে জেলে শব্দটি জাতিনামের আগে যুত্ত(হবে। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের জনগণনায় এ জেলায় জেলে-কৈবর্তদের সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে ৩০১৪ ও ২৮৪৮ জন।

নমশূদ্র ঃ ১৮৭২ ও ১৮৮১ র জনগণনায় এ জেলায় নমশূদ্র ছিল যথাত্র(মে ২১৭৮৪ ও ১৮৮৫৪ জন। নমশূদ্র ও চন্ডাল একই জাতির ভিন্ন নাম। বাংলার পূর্বভাগের প্রাচীনতম জাতির অন্যতম হল চন্ডাল। চন্ডাল শব্দটিও তাদের নিজস্ব প্রাচীন ভাষা থেকে আহৃত। আর্যরা বাংলায় আসার বহু আগেই তাদের জাতিগত ব্যবস্থাগুলি পাকাপোত্ত(হয়েছিল। রিজলির মতে, এরা আর্যদের অগ্রগমনকে তীব্র প্রতিরোধ করেন। ফলে হিন্দুবর্ণ বিভাগের বাইরেই রয়ে যায় এই অন্ত্যেবাসী গোষ্ঠী।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ স্বীকৃত, কন্যাপণ প্রচলিত, বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ। অধিকাংশ বৈষ(ব ধর্মাচার পালন করলেও প্রাচীন সর্বজীববাদী ধর্মাচারের অবশেষ এখনও আছে।

পোদ ঃ তপসিলী শ্রেণীভুত্ত(জাতি। অন্যথায় পুন্ডরীকা(বা পুড়া। ১৮৭২ সালে তৎকালীন মুর্শিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "Both the Pods of 24-Parganas and the Puras of Murshidabad exibit in physical appearance an approach to the aboriginal type. A Pod, when inclined to use fine language, calls himself a Pundarikaksha, which is a Sanskrit compound meaning lotus-eyed. I am inclined to derive this name and the origin of both these castes from the Poundras, who were an ancient aboriginal people inhabiting lower Bengal in the age of Mahabharata'. (A Statistical Account of Bengal, Vol-IX)"। মহাভারত ছাড়াও ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন ধর্মসূত্র ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে পুন্ড্রদেশ, পুন্ড্রবর্ধন রাজ্য (সাধারণভাবে বললে উত্তরবঙ্গ) ও পুন্ড্র জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য আমলে এ অঞ্চলে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়। রিজলির মতে পুন্ড্রদের চারটি উপবিভাগ। বাগান্দি, বাংলা, খোট্টা বা মৌনা এবং উড়িয়া। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় বাস করে মৌনা উপবিভাগের পুন্ড্র বা পোদ জাতি। রিজলির সময় বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও বিধবাবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ ছিল। পুন্ড্ররা কৃষিজীবি। পলু পোকার খাবারের জন্য পাতার চাষ এদের প্রধান জীবিকা।

রাজবংশী ঃ ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল যথাত্র(মে ১৭৬৪৮ ও ১৭৩৮২ জন। রিজলির মতে এরা উত্তরবঙ্গের কোচ জনজাতির সাথে অভিন্ন। আবার কারো কারো মতে নৃ-কৌলিক (Ethnic) বৈশিষ্ট্য বিচারে উত্তর বঙ্গীয় রাজবংশী থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবংশীরা একেবারেই আলাদা। এ জেলাতে তিওর এবং মাল জাতির একাংশও রাজবংশী নামে পরিচিত। কৃষি প্রধান জীবিকা। অনেকে মৎস্যজীবী। ফলে নদী ও বিলের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে রাজবংশীর আধিক্য দেখা যায়। একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত।

সারণী - ৪.২১

ব্লকভিত্তিক তপসিলী জাতি ও উপজাতির জনসংখ্যা ঃ ১৯৯১

ব্লক	তপসিলী জাতি	মোট জনসংখ্যার শতাংশ	উপজাতি	মোট জনসংখ্যার শতাংশ
বহরমপুর	৫৪২৪২	১৮.১২	৯৩৪৪	৩.১২
বেলডাঙ্গা-১	১২৯৩৪	৬.১৬	-	০.০০
বেলডাঙ্গা -২	১৭৫০০	৯.৯৪	২৩৩	০.১৩
হরিহরপাড়া	১৪৬১৫	৭.৮৯	২২৭৪	১.২৩
নওদা	১৩৪৭৯	৮.১৯	৫৩৪	০.৩২
ডোমকল	৭৭৬২	৩.০৭	৫৬৭	০.২২
জলঙ্গী	২১৮২৯	১২.৬৩	১৩৮৪	০.৮০
রানীনগর-১	৫৭৪১	৪.৫৪	৭৪	০.০৬
রানীনগর-২	২৭৪৬	২.০৯	৩৩৭	০.২৬
মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ	২৪৭২৬	১৫.৭০	৮৯১২	৫.৬৬
ভগবানগোলা -১	৬৫৬২	৪.৯৮	-	০.০০
ভগবানগোলা -২	১৯৬৭	১.৭৯	৪৭	০.০৪
লালগোলা	৩৩৪৩১	১৬.২০	৪৩	০.০২
নবগ্রাম	৪৩১৬১	২৬.৯৯	১২২৯৫	৬.৬৯
কান্দী	৩০৪৪৮	১৯.১০	২৪১০	১.৫১
খড়গ্রাম	৫৪৯৬৬	২৭.২১	২৫৩০	১.২৫
বড়এ(া	৫০২৪৬	২৫.০৭	২১৭১	১.০৮
ভরতপুর -১	২০৩৩৬	১৫.৭২	৫৯	০.০৫
ভরতপুর -২	২৪৭৮০	১৯.৪৮	১৩৪	০.১১
রঘুনাথগঞ্জ -১	২৭৭৬৯	২৩.৪৬	১৬৭৬	১.৩৩
রঘুনাথগঞ্জ -২	১২৬১৫	৮.১৫	৭৫	০.০৫
সুতি -১	১৫৫৭৯	১৩.৯৮	-	০.০০
সুতি -২	১৪৬৬৭	৯.৩১	-	০.০০
সামশেরগঞ্জ	১৩৪০২	৭.৪৬	-	০.০০
সাগরদীঘি	৪২৭৩১	২১.৪৮	১১০৮৬	৫.৫৭
ফরাক্কা	১৩৬৩২	৮.৭৮	২৫৬৯	১.৬৬

সুত্র ঃ জেলা জনগণনা দপ্তর, মুর্শিদাবাদ

সারণী

জাতি ও থানাভিত্তিক

জাতি	মোট	ফরাক্কা	সামশেরগঞ্জ	সুতি	রঘুনাথগঞ্জ	সাগরদীঘি	লালগোলা	ভগবানগোলা	রাণীনগর	ডোমকল
বাগদি	৫৪৫৫৮	২৯৩	৬৩	-	২৮	১৯৯১	৩৮৫	২১১	২৯	৪১৬
বেলদার	৫২	-	-	-	-	-	৫২	-	-	-
বাহেলিয়া	১৪৩	-	-	-	-	৪৫	-	৩৮	২৯	-
বাইতি	৫৫০	-	-	-	-	-	-	১৮৩	-	-
বাউড়ি	৪৯৬২	৪৩	-	-	১২	১০০	-	৫	-	-
বেদিয়া	১৮৭	-	-	-	-	-	-	৫	৮৭	-
ভুঁইমালি	২৬৮০	১৮	-	৬	৩১৯	৪১৫	১২১	১৪	৫১	৯৮
ভুঁইয়া	১১৬৯	১০৫	-	-	১	২৯২	৫	-	-	-
বিন্দ	২১০৫	-	৩১৬	-	২৯০	৬	-	১২৫	-	-
চামার	৪৪৯৭৮	৬৬১	৩৬১	২২৬০	২২৬৮	১৩৪৬	১১৩২	১৩৫৫	৫৭৭	৮১১
ধোবা	৩১১০	২৫০	২২৮	৬১	১০৭	৫৭	১৩	৩৫	১১২	৭
দোয়াই	১৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডোম	৭৪১৫	২১৪	১২১	১৪০	৪০২	৭৩৪	১২	৪৮	২৫	২০
দুসাদ	১৫৬৬	২৭৭	২৫২	৪৪৯	৭৮	-	২০	৯৫	-	-
ঘাসি	৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গণরি	২০৭৭	৭২	৬৪০	৭২	-	-	৪৬০	২৫৫	৩৯৫	-
হাড়ি	৮৭৬২	২২	১	১১	৪৭৯	১০৩১	৫	-	২৩৯	-
জেলে-কৈবত	৮৩৪৮	৬৭৮	২০৪	৪৫৭	১০২২	১৮১	২৪	৬৮	৪৩৬	৩৮০
ঝালোমালো	১৬৬৩৮	১৪৩৮	১৩৯০	১০৮৭	২৭৫৬	৬৩১	১৩১১	৫৩২	৭৬	১৯৭
কাদার	৫	৫	-	-	-	-	-	-	-	-
কামি	১৪৩	১	-	-	-	-	-	-	-	-
কাওড়া	৮৯	৯	২	-	-	১২	১	-	-	-
কোরঙ্গা	৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-
কাউর	৭৯	৩	৩	৬	-	-	৩৫	-	৩১	-

-৪.২০

জনসংখ্যা ঃ ১৯৭১

মুর্শিদাবাদ	জিয়াগঞ্জ	নবগ্রাম	খড়গ্রাম	বড়এ(া	কান্দী	ভরতপুর	বেলডাঙা	বহরমপুর	হরিহরপাড়া	নওদা	জলঙ্গী
৩৮৩	১৪৭	৩২৫২	৮৬৮১	১৬৬৯৩	৬৪৯৯	৬৭৮৩	২০৫৬	৪১৪১	১৭১৭	৭৭৩	১৫
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	৩০	-	-	-
৩	৮	৫১	-	-	-	১৩১	-	১	২	১৭১	-
৫২	১২	৫১৩	৩৫	৭৪৮	১৩৭২	৭০৪	৭২১	৫০৬	১২২	১৭	-
৩	১	-	১১	৫২	৪২	-	৬	-	-	-	-
৭৮	১৮	৬৪	১০২৩	১৫২	-	-	-	২০৫	১২	৮৪	২
৮৮	৪৩৪	১৬১	-	-	-	-	৩২	৫১	-	-	-
১৯৭	১০	-	-	-	-	১	৪১	১০১৯	-	-	-
৪৮৬	৮০২	১৬৯১	৪৩৩৪	৬৪৫২	৪৩৬২	৮০৬৪	২৬৫৬	১৮৯৭	৮৪৩	২২৪১	৩৭৯
২৭০	১৬৬	৯৩	৬১	১০২	২১৩	৪০৭	৬০	৭৫৩	৩২	৩৩	৫০
৭	-	৬	১২২	-	-	-	-	২	-	-	-
২৩৭	৩৪	৩৪৬	১৪৮৫	১০১৭	৭২৬	১০৩৭	২৯৩	৪৯৪	-	-	-
৩৫	২৭	-	-	-	-	১	-	-	-	১৪	-
-	-	-	-	-	-	-	৩১	-	-	-	-
-	-	৫	-	৭৫	১	-	৯৭	৫	-	-	-
-	৭৫	১৭২	৪২২	১৪৯৮	৮০৬	২৯২৭	৮১৩	৩৮৯	৩২	২৪০	-
৩৫৩	১১২	২৮৭	১৮৮	৩৪১	৩৯২	১২৩০	২৪৪	১১৩৯	৭২	১৯৭	৩৪৭
৮২৮	২৭৪	২২	১০৭৮	-	১১০	-	৫৭৪	১৩৩১	৮৮১	১৩১	১৯৯১
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩০	১২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	২৪	-	-	-	৪১	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-

সারণী

জাতি ও থানাভিত্তিক

জাতি	মোট	ফরাক্কা	সামশেরগঞ্জ	সুতি	রঘুনাথগঞ্জ	সাগরদিঘী	লালগোলা	ভগবানগোলা	রাণীনগর	ডোমকল
কেওট	১৬৮৯	১৮৬	২৯	৩১৪	১	১৬	-	-	৭৫	-
খয়ড়া	১৯	১০	-	-	-	-	-	-	-	-
কোনাই	৩১৮০৫	২২	১৭৩	৪৫১	৩২৭৩	৪৪৪৩	৪	-	২	৯
কনোয়ার	৭৪	৭৩	-	-	১	-	-	-	-	১
কোটাল	৯২৮	১২	-	-	২০৭	-	-	-	-	-
খাটিক	১২০	-	-	-	-	-	১২০	-	-	-
লোহার	১৭৩	৩৮	-	-	৯	২	-	১১২	-	-
মাহার	১৩৬৮	৪৫	৭৬	২৮২	৬০	৭৬	৩৮৮	-	-	-
মাল	২৭৮৮৯	৩৫৬	৬২	৬০৭	২৯২২	১২৫২৯	৪৭৭	৮৩	৩৮৮	-
মাল্লা	১৩২৪	২২৯	৬৭২	২৫	২২৫	২৬	-	৩৭	-	১৫৬
মেথর	৩০০৩	৬৩৭	৭৬	২৬	৫৪	২৪	১০৭	৭	২৬	৩২
মুসাহর	৯২৪	৭৫	-	-	-	-	-	-	-	৪৫
নমশূদ্র	২৫৫৫৮	৬৪৯	১৫৯	৪৫৯	৫৭১	৫৯	২৯৫	৬৭৯	৭৮১	-
নুনিয়া	১৮০৫	৮২	-	৩১১	৫৫১	৬৪	৬৬০	৩৩	-	১৮৩৬
পালিয়া	১১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পাশি	৫১	৩৫	৩	-	-	১	-	-	-	-
পাটনি	১৮৪৫	-	-	২৩	১২৪	৩৩	৮৭	-	৬০	-
পোদ	১৮৯৯৩	৮	-	১৪৫	৪০৯৪	২১৬৮	২২৬৫	৭৭৪	-	১২৫
রাজবংশী	৩৮৩৭৩	৬৩৬	৩৮৩১	১০৮১৮	৩৫০৪	১৬	১১৫৭	১৪৪	৬১	-
রাজোয়ার	২১১৫	১৬৮	-	-	৬	২২	২	-	৪০	৪২৫
শুঁড়ি	২৬২৭	৪৭৪	৭২	৫২	৪৯	৭৮	১৪২	১৫২	-	-
তিওড়	৩৯৮২	১৮৭	৭২	৬২৭	৪৫৫	৭১০	-	২	-	-
তুরি	১১৯৪	৭২	-	১	-	-	-	-	-	৫
অনির্ণীত	৩১৯৫২	৬৪১	৫৪	৩৪৫	২৮৫৮	৪৯	১৫৮৬	৩০৬	৩৯	১৭৭২
মোট	৩৫৭৪১	৮৯৩৮	৮৮৬০	১৯০৩৫	২৬৭২৬	২৭১৬৭	১১০৮৪	৫২৯৮	৩৫৩৮	৬২৮৫

সূত্র ঃ ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, ১৯৭১, সিরিজ-২২, পার্ট-১০-৪

-৪.২০

জনসংখ্যা ঃ ১৯৭১

মুর্শিদাবাদ	জিয়াগঞ্জ	নবগ্রাম	খড়গ্রাম	বড়এ্রা	কান্দী	ভরতপুর	বেলডাঙ্গা	বহরমপুর	হরিহরপাড়া	নওদা	জলঙ্গী
১১	২	-	-	১০৭২	১০	-	-	৩	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৬৯	১	৯৬৩৩	৬৪৭৮	১০৫১	১৪৪৭	৭৩৩	২৯২৪	৭৫৩	৬২	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	৭১	১২৪	৪২	৪৬৫	৭	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	-	৬	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৫৬	-	৭	৩১৩	২৯	-	১৭	-	১৯	-	-	-
৫৩৩	৪৭৪	৩৫১৩	৩০৫২	৪০০	৩৭৫	৩	১৮৭	১৫৭৮	৪	১১	৯৯
২৩	১৭	৩	৫	-	-	-	২	১৮	৬	৪	-
১৬৬	৬১২	৯	২৯	৩৯৩	১৩৬	৩০	১২২	৫০৩	-	১	-
৪	-	-	-	-	১৪	-	৯	৮২২	-	-	-
৫৭৯	৮২৯	১০১৯	৭৪৩	২৩২৮	-	১৩৬৩	১৩৪৫	৫৭৭১	২৬৯৪	১৭১০	১৬২৯
-	৯৯	-	-	-	-	-	৫	-	-	-	-
-	১১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	৭	-	-	-	-	-	-	৫	-	-	-
-	-	৩৭১	-	-	-	১৭৫	১৯৯	১২৫	৮২	৪৩০	১১
২০০২	-	১৭৯০	২৩২০	১২৭	-	-	৫	১৭৫১	১৭৬	৮১	৮৭
৪০০	১০৮১	৪৪০৯	৫১১০	৭৩	২৪৮০	১৫০৫	৮০৮	১২২৪	১২৩	৩৯১	-
৩৫০	৪	-	-	১৩৫	-	-	৬০৩	৪৯৪	১৯৯	৯৬	-
৫৪	৪৮	৭০	৬৯	৫৪০	১৭৯	২৮২	২৩৩	৭১	-	২৯	৩৩
-	-	৪৬২	৮৪৭	-	১৪	৩১	-	১	২১০	২৭৫	৯৪
-	৭০	৫৬	৯১০	-	-	-	-	২১	-	৩৩	-
২৫৫২	১৪৮	১০৭৭	১০৫০	৬২০	২৩৬৯	২৯৭৫	৪০৮৩	৩১২২	১৯৭৬	১৩৯০	২৯৮০
১০৪০১	৫৫২৩	৩০১১৪	৩৪৮৩৭	৩১৬৯৫	২৩৫৫৮	২৮৯০৪	১৮১৫৬	২৮২৪৮	৯১৯১	৮৪৯৬	৬২৮৫

লোকভাষা

[ইংরেজ আমলে, শাসনকাজের সুবিধার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন জেলা গঠিত হয়। সংস্কৃতি, ভাষা অথবা ভৌগোলিক সমরূপতার ভিত্তিতে এ সমস্ত জেলার সীমানা নির্ধারিত হয়নি। বঙ্গের ভাষার মানচিত্রে তাই একই জেলায় একাধিক উপভাষা -অঞ্চল খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সার্বিক কোন ভাষা-তাত্ত্বিক সমী(া হয়নি। সুতরাং (েত্রসমী(ার পর্যাপ্ত আয়োজন ব্যতিরেকে জেলাগুলির কথ্য ভাষার বিবরণে অসম্পূর্ণতা অনিবার্য।]

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর এবং উত্তরপূর্বে গঙ্গা এবং পদ্মা(মালদহ ও রাজশাহী থেকে এ জেলাকে পৃথক করেছে। নদী ভাগীরথীর জল বিভাজন রেখা মুর্শিদাবাদকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। ভাগীরথীর পশ্চিমভাগ রাঢ় এবং পূর্বভাগ বাগড়ী নামে পরিচিত। এ দু-খণ্ডের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, বৃ(লতা, জলবায়ু, উৎপন্ন ফসল, ধর্ম-সংস্কৃতি এবং নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য আছে। আছে ভাষাগত পার্থক্যও। মুর্শিদাবাদের দ(ণে এবং দ(ণপূর্বে বর্ধমান এবং নদীয়া জেলা। দ(ণ-পূর্বে অংশত জলঙ্গী নদী নদীয়া-মুর্শিদাবাদের সীমা নির্ধারণ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমে বীরভূম এবং সাঁওতাল পরগণা (ঝাড়খন্ড)।

দেশের আর্থ-রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের ইতিহাসের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ বিশেষভাবে জড়িত ছিল। সুতরাং এ জেলার ভাষা বিষয়ক আলোচনায় আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক সচলতার কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্গত ছিল মালদহ, পাবনা-রাজশাহী-নদীয়ার অংশবিশেষ, বগুড়া-বীরভূমের একাংশ এবং ভাগলপুর। ইংরেজ আমলে এ জেলার সীমারেখায় নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। এ পরিবর্তনের সূচনা ১৭৯৩-এ, সমাপ্তি ১৯২৫-এ।

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমা পরিবর্তন ও প্রসারের ফলে রাঢ়, বরেন্দ্রীর ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে এ জেলার সম্বন্ধ ঘটেছে। বিহারের হিন্দি ভাষা, সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে স্থান বিনিময়ের সূত্রে হিন্দি এবং সাঁওতালি ভাষা এ জেলার ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে, ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। অবস্থানগত দিকে হিন্দী ভাষার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সীমারেখা মিশেছে। আর রাঢ়ী-বাঙ্গালী-বরেন্দ্রীর ভাষাবৃত্তের প্রায় কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদের অবস্থান। মধ্যযুগের রাজধানী, টাকশাল, বাণিজ্যকেন্দ্র মুর্শিদাবাদ অন্য জেলা, প্রদেশ, এমন কি বর্হিভারতীয় জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করে এনেছিল। এ সমস্ত মানুষ, তাদের ভাষা নিয়ে মিশে গেছে এখানকার জনবৃত্তে। অষ্টাদশ শতকে জৈন কবি নিহাল নানা জাতি, ভিন্ন ভাষাভাষীকে এখানে সমবেত দেখেছিলেন। হান্টার এ জেলার জনতত্ত্বের আলোচনায় 'Mixed population' বিশেষণ ব্যবহার করেছেন।

শিল্পবিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সামন্ত পর্বের বিচ্ছিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে যায়। ভাষা ও সংস্কৃতিও আঞ্চলিকতা পরিহার করে ত্র(মশ ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের শিল্প বিকাশ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব অনগ্রসর। বাজার-অর্থনীতি, পঞ্চায়েতের প্রসারে তাই গ্রাম্য বিচ্ছিন্নতা অনেকটা ভেঙেও ভাঙেনি। শি(ার ব্যাপক প্রসার হলে শি(তেরা একই লেখ্যভাষা ব্যবহার করে ঐক্যবদ্ধ হয়। মুর্শিদাবাদে শি(ার হার খুব বেশি নয়। নগর ও গ্রামের শি(ার আনুপাতিক হারে আছে বিপুল ফারাক। উচ্চবর্গের, বর্ণহিন্দু পু(ষদের তুলনায় আদিবাসী, তপসিলী, নিম্নবর্গের ইসলামি জনতা এবং মহিলাদের মধ্যে যথার্থ শি(ার প্রসার খুব কম। ফলতঃ শি(া এবং শি(িত জনের লেখ্য ভাষা, এ জেলার জনগণকে ঐক্যবদ্ধ না করে বরং বিভক্ত(করেছে। প্রাচীনকাল থেকে অবাঙালী নানা জনগোষ্ঠী মুর্শিদাবাদে বসতি করেছেন। তাদের ভাষাও স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে কয়েকটি সঙ্কর ভাষা সৃষ্টি করেছে। আর যে সমস্ত অবঙ্গভাষী জনতা নিজেদের ভাষাকে বজায় রেখে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে বঙ্গভাষায় কথা বলেন, অর্থাৎ বাংলা যাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা, তাদের ভাষার আছে নানা বৈশিষ্ট্য। আর অতীতের যে অবঙ্গভাষীগণ, পূর্ণভাবে বাংলাকেই লেখনে বলনে ব্যবহার করছেন, তাদের উচ্চারণ রীতিতে, শব্দভাণ্ডারের আছে সবিশেষ স্বাতন্ত্র্য।

আমাদের আধা ঔপনিবেশিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে অসংখ্য উপশ্রেণী(ভাষাও এ উপবিভাগের ল(ণে চিহ্নি(ত। ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, সংস্কৃতির ভিন্নতা এ জেলাতেও নানা সামাজিক উপভাষার (Sociolect) জন্ম দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভাষা সমী(ায় সাতাশটি ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। এগুলি মূলত দ্রাবিড়, এশিয় অস্ট্রিক এবং আর্য গোষ্ঠীর ভাষা। ১৯৬১-এর ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক - এ মালপাহাড়িদের ভাষাকে বাংলা বলে গণ্য করা হয়েছে। 'মাল' দ্রাবিড় শব্দ, অর্থ পাহাড়(এ জনগোষ্ঠী মূলতঃ দ্রাবিড় ভাষার অপভ্রংশে কথা বলে। বাংলা বলতে পারে অনেকে, তাদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বহু বাংলা শব্দ। কিন্তু মালপাহাড়িদের ভাষাটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা। জেলার সমী(া থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ছাড়া অন্য ভাষাগুলি ত্র(মশ

(য়িত হয়ে বঙ্গভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এমন কি সাঁওতাল ভাষীদের সংখ্যাও এ জেলায় হ্রাস পেয়েছে। উড়িয়া প্রভৃতি দু'একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের উত্তরপু(ষেরা বাংলায় কথা বলে, পড়ালেখা করে। রাজবংশী জনগণ উত্তরবঙ্গের কামরূপী উপভাষা বিস্মৃত হয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মুর্শিদাবাদে দ্বিভাষী জনগোষ্ঠীর অনুপাত কম ৮.৮৫% ৩.০৭%। তবে কারো কারো ধারণা যে জনগণনা সমী(কদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ, এ বিষয়ে যথেষ্ট সত্রি(য়। একসময়ে এ জেলায় হিন্দি-উর্দুকে একই ভাষা হিসাবে গণ্য করা হতো। কালপ্রবাহে হিন্দির (য় এবং বঙ্গভাষীর বৃদ্ধি ঘটেছে মুর্শিদাবাদে। মোট জনসংখ্যার বঙ্গভাষী ও হিন্দিভাষীর তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ-

	১৯৩১	১৯৫১	১৯৬১
বঙ্গভাষী	৯২·৬২%	৯৬·১৫%	৯৬·৮৪%
হিন্দিভাষী	৫·০৬%	২·১৩%	১·৪৯%

হিন্দিভাষীর সংখ্যা স্বাধীনোত্তর মুর্শিদাবাদে দ্রুত কমে গেছে। জেলা পরিত্যাগ করে অবাঙালীদের অন্যপ্রদেশ বা পাকিস্তানে চলে যাওয়া এবং অধিক সংখ্যক বঙ্গভাষী উদ্বাস্তুর এ জেলায় আগমন দিয়ে এ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বরং দ্বিভাষীগণ এবং অবঙ্গভাষীগণ ত্র(মেই বাংলাকে মাতৃভাষা এবং শি(ার বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছেন এ সিদ্ধান্তের প(বহু উদাহরণ আছে।

ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ এবং বহরমপুরে হিন্দি বলয় থেকে আগত বহু গোষ্ঠী, এখন থেকে তিরিশ বছর আগেও বাড়িতে হিন্দিতে কথা বলতেন। সালার-ফরাক্কা-সুতির বহু অভিজাত ইসলামি পরিবারে উর্দুর চল ছিল। এরা সবাই দোভাষী ছিল। মূলত হিন্দিতে কথা বললেও, সে ভাষায় বাংলা শব্দ এবং বাক্‌ভঙ্গী অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, বহরমপুর শহরের গোরাবাজারের মাগধী-কনৌজী সাহা, ধোবা, নাপিত প্রমুখদের ভাষার উদাহরণ দেওয়া যায়। তারা বলতো 'উস্ লড়কা উৎপাত কিস্‌থা'। এর সঠিক হিন্দি রূপটি হল, 'উস লড়কা তং কিয়া থা'। এখানে 'তং'-এর পরিবর্তে আঞ্চলিক 'উৎপাত' শব্দের ব্যবহার এবং কিস্‌থা ত্রি(য়ার ব্যবহার ল(ণীয়। এরা বলে, 'তিসকো হাম বোলা থা'। শুদ্ধ হিন্দিতে 'তিস্‌কো' নয় 'তুঝে' শব্দ ব্যবহৃত হবে। মূল হিন্দি শব্দের বিকৃতি , ত্রি(য়াপদের রূপান্তর, স্বর/ব্যঞ্জনাগম এ কথ্য হিন্দির বৈশিষ্ট্য। এরকম বহু দৃষ্টান্ত জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ, ভগবানগোলা, সালার ইত্যাদির অবঙ্গভাষীদের মধ্যে দেখা যায়। বহরমপুর শহরের গোরাবাজারের সাহা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রায় সকলে এখন ঘরে বাইরে বঙ্গভাষী। কিন্তু এদের কথ্য বাংলায় পূর্বপু(ষদের অনেক শব্দ, উচ্চারণ রীতির রেশ আছে। চারপাশের জনগণকেও তারা প্রভাবিত করে, গোরাবাজারের কথ্য বাংলার বিশিষ্ট এক রীতিকে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঊনিশ শতকীয় বাণিজ্যকেন্দ্র সৈদাবাদের কথ্য বাংলায় নাগরালির সঙ্গে রঙ্গব্যঙ্গ কৌতুক মিশে এক বিশিষ্ট কথ্য ভাষা প্রচলিত ছিল। প্রসন্ননাথ রায় এক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র উদ্ধৃত করেছেন— বাবাজীবন, রোকায় জানিবা আচ্ছিন মাছের পাচহি (৫ই আশ্বিন) তারিখে তিন কড়্যা (শ্রাদ্ধ কর্তার পিতা তিনকড়ি) ত ল্যাট (রেশম সংত্র(ান্ত শব্দ, মরে যাওয়া) খোয়াচ্ছে। তুমি ঐ মাছের পনরহি তারিখে আমার সয়দাবাদ ভবনে আছিয়া লুচি আর গোল্লা লুছবা (নিরামিষ খাবে)।

জেলার বিন্দ' জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক দুর্বলতর শ্রেণী এবং শি(ার দিকেও পশ্চাদ্‌পদ। প্রান্তিক চাষী, কৃষিমজুর, মেয়েদের সঙ্জীর ব্যবসা ও গৃহে মদ তৈরী করে বিত্র(য়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ হয়। কথ্য ভোজপুরীর এক উপভাষা এরা ব্যবহার করে চলেছেন। নবগ্রামের গোপগ্রাম থেকে ভগবানগোলার বড়বড়িয়া পর্যন্ত প্রসারিত ভূখণ্ডে যে গোপ জনগোষ্ঠী বাস করেন ধর্মাদর্শে তারা কবীরপন্থী, ভোজপুরী উপভাষায় তারা বাড়িতে কথা বলেন(ধর্ম-সংস্কৃতি পরিচালনা করেন। আবার বাংলা মাতৃভাষার মতই বলেন। আধুনিক প্রজন্মের প্রায় সমস্ত ছেলে-মেয়েরা স্কুলে কলেজে বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা করায়, হিন্দি অ(র তাদের অচেনা। ঘরে বাইরে এরা ত্র(মশঃ বঙ্গভাষী হয়ে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানাদিতে ভোজপুরীতে রচিত গান আর আকর্ষণ করে না ত(ণ প্রজন্মকে।

এদের লটকান গান—

বৃন্দাবন কুঞ্জবনা মধুবনকে বিচাওয়া
হুয়াইতো ধইলে কান্‌হা রাধেজীকে হাথওয়া।।

গোচারণের মৈষালের গানের ভাষা বাংলা—

ওরে চাইল লিলাম টাইল লিলাম
হাতে লিলাম লাঠি।।
ওরে মৈষাল মনে রাখ বাড়ি রে কি।।

নবগ্রামের সাঁওতালগণও এ দ্বৈভাষিক রীতির গানে দ(। মুর্শিদাবাদের পাঠান, জোলা, গোপ জনগণ তাদের ভাষাদি ভুলে এখন পুরো বঙ্গভাষী হয়ে গেছেন। তাদের কথ্য বাংলায়, প্রাচীন ভাষার বহু শব্দাদি এখনো ব্যবহৃতহয়। যেমন—কোস (কোল), মির্জাই (জামা), দলচি (বালতি), শেচা (বিছানা), লুচকন/কালছে (হাতা/চামচ), ছিপা (থালা), তেয়ান/শালুন (তরকারী), লাহারী

(জলখাবার), চুখা (আলুসেদ্ধ)। এরা বলে আমরাকে, তোমরাকে (তোমাদেরকে), শালাহেরা (শালারা)। অতীতের নিমতিতা অঞ্চলের এ ধরণের শব্দ ব্যবহারের আলোচনা করেছেন নলিনীকান্ত সরকার।

চাঁই জনগোষ্ঠী মধ্যভারত থেকে আগত এক আদিম জনজাতির ভগ্নাংশ। পদ্মা, ভাগীরথী, ভৈরব নদের তীরে এবং চরে দলবদ্ধভাবে চাঁই-এরা বাস করে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দিনাজপুর (উত্তর ও দ(িণ) জেলায় এদের সংখ্যা প্রায় তিরিশ ল(। অনেকে এদের নুনিয়া এবং মাল্লাদের উপশাখা বিবেচনা করেন। অনেকে থা(, রাজি, নাট প্রভৃতি মোঙ্গল-ভাবাপন্ন বেদে গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের সম্পর্কের কথা বলেছেন। চাঁইদের অনেকে মনে করেন যে চাঁই, বিন্দ, ধানুক, নাগর হল একই জনজাতির চারটি 'থাক'। শণ ও সব্জিচাষ, ডাল সব্জি বিত্র(য়, খয়ের উৎপাদন, শনের দড়ি তৈরী, নৌবাহনের সঙ্গে অতীতে চাঁইগণ জড়িত ছিল। বিহারে 'কুঁজরো' দের অপভ্রংশ হিসাবে বিভিন্ন জেলায় চাঁইয়েরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। সেখানে তারা তপসিলী শ্রেণীভুক্ত(। বঙ্গে চাঁইয়েরা মূলতঃ সব্জীচাষী ও ব্যবসায়ী(জলচল গোষ্ঠী(—এখানে তাঁরা তপসিল শ্রেণীভুক্তি(র জন্য আন্দোলনকারী। মৈথিলি কথ্য অপভ্রংশের সঙ্গে মালদহ-জঙ্গীপুরের কথ্য বাংলার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে চাঁইদের সঙ্কর ভাষা। কলকাতা বি(বিদ্যালয়ে পরেশ ভট্টাচার্যের কাছে চাঁই ভাষা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। চাঁইদের অনেকেই বাংলাও বলেন। আলকাপে, কবিগানে, যাত্রাদিতে ঝাকসুর মত বহু প্রখ্যাত চাঁই লোকশিল্পী খুঁজে পাওয়া যায়।

নিমতিতার ইংলিশ গ্রামের মানুষজন কথ্য হিন্দি-বাংলার মিশ্রিত সঙ্কর ভাষা ব্যবহার করে। গিরিয়ার 'লুড়কি পাঠান'দের মধ্যেও সঙ্কর ভাষার প্রচলন আছে। কৃষ(পুর স্টেশনের অদূরে মাদারী বুরহানা ফকিরদের উত্তরপু(ষেরা এবং জঙ্গীপুরের দিকে ফকির পাড়ার মানুষজন হিন্দি-ফারসী-বাংলা মিশ্রিত সঙ্কর ভাষা ব্যবহার করতেন। সঙ্কর ভাষাগুলি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। কেবল চাঁই ভাষাই টিকে আছে। তুলসীচরণ মণ্ডলের মতো বহুজন এ ভাষাকে সাহিত্য রচনায় ব্যবহার করছেন। গ্রিয়ারসন্ মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষাকে রাঢ়ী উপভাষার অন্তর্গত বিবেচনা করেছেন। The central dialect of Bengal, as spoken by the educated class, is that usually taken as the standard of the polite conversation। তিনি মুর্শিদাবাদের ভাষার নিদর্শন হিসাবে একটি বাউলগান উদ্ধৃত করেছেন—

'ভেবে দেখ, মন, কেউ কারো নয় মিছে মায়া ভূমণ্ডলে
ভজলি নারে গু(র চরণ, বদ্ধ হলি মায়া জালে।' ইত্যাদি ।

গানটি শি(িত উচ্চবর্গের রচনা। তাছাড়া কবিতার ভাষা লেখ্য বা কথ্য গদ্য থেকে পৃথক। মুখের ভাষা বিষয়বদ্ধ হলেও, তা বিষয়ের আলোচনায় সংহত এবং Structured নয়। কবিতার মতো, কথ্য গদ্যে আরম্ভ, বিস্তার, শেষ(শব্দ, শব্দহীনতা(প্রচ্ছন্ন আবেগ নেই। নেই শব্দের লোপ, রূপান্তর ও নতুন শব্দ সৃষ্টি। কবিতার পদ ও বাক্য গঠন রীতি ভিন্ন। তাই আলোচ্য গানটি মুর্শিদাবাদের কথ্য গদ্যের নমুনা হিসাবে আদর্শ নয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাঢ়ী উপভাষাকে দ(িণ-পশ্চিমা ভাগে বিভক্ত(করে, পশ্চিমা রাঢ়ীকে পশ্চিমা এবং পূর্বভাগে বিভক্ত(করে, মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলাকে পূর্ব-রাঢ়ী বা Standard Colloquial Bengali হিসাবে বর্ণনা করেছেন। জেলার শি(িত মানুষ বা বহরমপুরের নাগরিকদের কথ্য বাংলা শিষ্ট চলিত হলেও, মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলার পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য আছে। গবেষণায় বা জেলা গেজেট বা সেন্সাস হান্ডবুকে প্রাক্তন তথ্যের পুর্নমুদ্রণ আছে, নতুন সমী(ালব্ধ কোন তথ্য নেই।

১৩১৪ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের স্মারক পত্রে একটি গু(ত্বপূর্ণ ভাষা বিষয়ক নিবন্ধ লিখেছিলেন প্রসন্ননাথ রায়। লোক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা থেকে তিনি নানা উদাহরণ দিয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের কথ্য বাংলার ভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য এ নিবন্ধে চমৎকারভাবে চিহ্নি(ত হয়েছে। রাখালরাজ রায়, 'জঙ্গীপুরের (মুর্শিদাবাদ) গ্রাম্যশব্দ', নিয়ে এক আকর্ষণীয় রচনা প্রকাশ করেছিলেন 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা'য় (২২ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৩২২, পৃ. ২০৩-২৩৬)। উক্ত(পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 'রেশম শিল্পের পারিভাষিক শব্দ' (২৩বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩২৩, পৃ. ৭৫--৭৮)। কলকাতা বি(বিদ্যালয় থেকে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সংগৃহীত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের গ্রাম্য শব্দ। সেগুলি প্রকাশের অপে(ায়। কল্যাণী বি(বিদ্যালয়ে মুর্শিদাবাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করে পি.এইচ.ডি. পেয়েছেন জনৈক অধ্যাপক। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এ ছাড়া বহি(রায় লিখেছেন, মুর্শিদাবাদের গ্রাম্য ভাষা (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবার, ২৫/২/১৯৬২)। লায়েক আলি খাঁন রচনা করেছেন, মুর্শিদাবাদের বাংলা লোকভাষা (প্রাকৃত, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, বহরমপুর)। চতুষ্কোণ পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩৮২, পৃ.৭৩৯--৭৪৪) শিশির কুমার সিংহ লিখেছিলেন, 'মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য', শক্তি(নাথ ঝার, 'মুর্শিদাবাদ জেলার ভাষা ঃ কথ্য বাংলা' প্রকাশিত হয় বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বী(ণ, ১৯৯৩-এ।

মুর্শিদাবাদের রাঢ়ের অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমপ্রান্তের কথ্য বাংলাকে তিনভাগে বিভক্ত করে চিহ্নিত করা যায়। (ক) ফরাক্কা- সামশেরগঞ্জ-সুতি থানা ঝাড়খন্ডের সীমান্ত সংলগ্ন। এ সমস্ত এলাকায় বহু হিন্দি-উর্দুভাষী মানুষ আছে। সীমান্তের পশ্চিমাংশে হিন্দি ভাষার স্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়। আমি উচ্চারিত হয়—হামি। এখানকার কথ্য বাংলায় হিন্দি ও উর্দু শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে এবং উচ্চারণে হিন্দির টান আছে। এ থানাগুলির পূর্বাঞ্চলের ভাষা আলাদা এবং তা জঙ্গীপুর ভাষাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। (খ) রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গীপুর-সাগরদীঘি থানার কথ্য বাংলায় হিন্দির প্রভাব ক্ষীণ হয়েছে। হামি, হামাকের-হ-এর উচ্চারণ এখানে অস্পষ্ট। এখানে শব্দের অন্ত্য বিশেষে জোর (accent) পড়ে কথায় টান থাকে ঘটে স্বতোনাসিক্যীভবন, হাঁসি। এ কথ্য রীতি মালদহ শহর পর্যন্ত প্রসারিত। এ কথ্য ভাষার আদর্শরূপ পাওয়া যায় যায় রঘুনাথগঞ্জে। দাদাঠাকুর তাঁর রচনায় এ ভাষাকে ব্যবহার করছেন। নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'কাঞ্চনতলার কাপে' -এ ভাষাকে ব্যবহার করে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। মালদহের গম্ভীরায়, মুর্শিদাবাদের আলকাপে এ ভাষাটি শোনা যায়। এ রীতিটি ভগবানগোলা লালগোলার অংশ বিশেষে প্রসারিত হয়েছে। এ ভাষার সীমান্তে রয়েছে বরেন্দ্রী উপভাষার উপস্থিতি। এ রীতির শব্দ উচ্চারণে এক বিশেষ কাঠিন্য আছে আছে শব্দান্তের সুরের রেশ।

শব্দে-উ-এর আগম হয়—হীরামুন, আমুন ধান, নন্দু (ননদ), বহনু ভাতারি (বোনাই ভাতারি)।

সম্বোধনে শব্দান্তে যুক্ত হয় আ— দেওরা, সসুরা (দেওর, শ্বশুর)।

আ > ই হয় — সেখানে / সেখিনে

আদি/অন্ত-ন- > ল তে রূপান্তরিত হয়—লিয়ে, কড়াল (কড়ার)

পুরুষভেদে ক্রিয়ার ব্যবহার বিশেষত্বপূর্ণ—

দ্যান বাবু টাকা দ্যান, বাড়ি চলা যায়।

এখানে পদান্তের যুক্ত ব্যঞ্জনে স্বরলুপ্ত হয়—গিরস্ত্ (গৃহস্থ)।

কিছু বিশিষ্ট বিশেষ্যপদ শোনা যায় এ অঞ্চলে—আঙ্গারা (লঙ্কা), সিঙ্গারা (পানিফল)

বড়এা, খড়গ্রাম, ভরতপুর, কান্দীর উপভাষার একদিকে সাঁওতাল পরগণার অষ্ট্রিক প্রভাব, বীরভূমের প্রভাব অন্যদিকে বর্ধমানের রাঢ়ীর প্রভাব পড়েছে। কান্দী মহকুমার জনতত্ত্বে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রাচীন উপজাতি ও তপসিলি গোষ্ঠীর প্রাধান্য আছে। আছে বঙ্গীকৃত ভূমিহার এবং উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ গোষ্ঠীর উপস্থিতি। আঞ্চলিক শব্দ, উচ্চারণ রীতি, কথার টানে কান্দি মহকুমার ভাষা স্বতন্ত্র। রাঢ়ের উত্তরাংশের ভাষা থেকে এই দক্ষিণাংশের ভাষা ভিন্ন।

উত্তর বা পশ্চিম রাঢ়	দক্ষিণ বা পূর্ব রাঢ়
হামি	আম্ভি
হামাকে	আম্ভাকে

দক্ষিণ/পূর্ব রাঢ়ের সর্বনাম ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আছে—

তুমি / তুই, তু

আমাকে / আমাই

ওরা / অরা, উয়ারা, কতি, ছে

তৎ, অদস, অখদ, যুষ্মদ শব্দে পঞ্চমীর একবচনে- হোৎকে ব্যবহৃত হয়।

তোমা হতে / হোৎকে

ও হতে / ও হোৎকে

বাউড়ি ইত্যাদি নিম্নবর্গের জনতার ভাষায়

ড় > র — বর, নারা, দরি

র > ড় — মড়া, পড়াণ (পরাণ), সড়া

ক্রিয়া সংক্ষিপ্ত হয়, স্বরসঙ্গতি ঘটে যায়—

গিয়েছে, নিয়েছে, খেয়েছে > যেছে, নেছে, খেছে

করিলাম, বলিলাম > কল্যাম, বল্যাম

মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ও বাগড়ি বিভাগের মধ্যস্থলে রয়েছে লালবাগ, বহরমপুর শহর, নবগ্রামের একাংশ। দেশবিভাগের পূর্বে এখানে উত্তর রাঢ়ী ভদ্রলোকদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। জঙ্গীপুরের টান, কান্দীর উচ্চারণ বিকৃতি নেই এখানে। এ কথ্য রীতিটি বেলডাঙ্গা, নওদা, জলঙ্গীর মধ্য দিয়ে নদীয়া সীমান্তে মিশেছে।

মুর্শিদাবাদের রাঢ় ভূখণ্ডের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা চলে যে—

(ক) ও-আ-/এ > অ্যা হিসাবে উচ্চারিত হয়—বুনা>বুন্যা, তুলা>তুল্যা।

(খ) অ, ও > উ কারে পরিণত হয় ক্রিয়াপদে পোষ>পুষ, বোঝা>বুঝ, বলছি>বুলছি, বল>বুল।

(গ) স/শ উচ্চারিত হয় > ছ

ছুন কবিরাজ মহাছয় তোমার বুদ্ধি অতিছয়

বুলছো তুমি ভাগবতটা বাছের কৃত নয়।।

অতীত ত্রি(য়ার মধ্যে-ল-এর আগম ঘটে—হোল্ছিল, গেল্ছিলা শব্দের আদিতে-র-আসে—উকিল > (কীল।

ড় > ঢ় তে পরিণত হয় — বুড়া > বুঢ়া (বুড়্হা)

মূর্ধণীভবন হয়— স্মরণ > সড়ণ

ন > ল হয় — লিল লিল জাতিকুল

ক > খ উচ্চারিত হয় — কাকে > কাখে

(ঙ) এ উপভাষায়-বট-শব্দ ব্যবহৃত হয়—কুথা যাবি বটেক।

গম-ধাতু সকর্মক রূপে ব্যবহৃত হয়—এখানকে এস, ঘরকে যাও, ধানকে গেল্ছিলাম।

ইয়া-অন্তক অসমাপিকা ত্রি(য়ায়-ং- যুক্ত(হয়।

করিং, যাইং, ডুবিং < করিয়া, যাইয়া, ডুবিয়া

আচ্ছা-শব্দের পরিবর্তে হোক--ব্যবহৃত হয়—

কাল তু আম্ভার ঘর যেও, হোক

চলিত শব্দ দ্বিত্বের বিপর্যয় করা হয়

মারামারি, গালাগালি > মারিমারা, গালিগালা

বিশিষ্ট কিছু শব্দ ব্যবহৃত হয় রাঢ়ে—

সী/চী (নারী), ওসারা (বারান্দা), চিক্যাস (আলো), ভোইড়, কল্লা (দুষ্ট), গুধ্যা-গুধি (ছেলে-মেয়ে) প্রভৃতি।

ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্তে জিয়াগঞ্জ, লালবাগ, বহরমপুর শহর ছাড়িয়ে শু(হয়েছে বাগড়ী। উত্তর বাগড়ীর লালগোলা , ভগবানগোলা এবং রাণীনগর থানার অংশবিশেষে জঙ্গীপুরী কথ্যরীতির প্রভাবের সঙ্গে চিহ্নি(ত করা যায় পদ্মাপারের কুষ্টিয়া-রাজশাহীর ভাষার প্রভাব। ভাগীরথী-পদ্মার মধ্যাঞ্চলে (রাণীনগর, জলঙ্গী, ডোমকল, হরিহরপাড়া, বেলডাঙ্গা, রেজিনগর, নওদা) দরিদ্র চাষী এবং হস্তশিল্পী ইসলামি অনভিজাত জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। বাগড়ীর দ(ণে কালান্তর মিশেছে নদীয়ার সঙ্গে। বাগড়ীর দরিদ্র চাষী এবং হস্তশিল্পিদের, ইসলামি সামাজিকদের ভাষায় অনেক ইসলামি শব্দ এবং গ্রাম্য আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাগড়ীর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের এবং রাঢ়ের অভিজাত ইসলামিদের ভাষা থেকে এ কথ্য রীতির স্বাতন্ত্র্য আছে।

পদের আদি অ > ঔ উচ্চারিত হয়—অন্বেষণ>ঔন্বেষণ

পদের আদি অ অথবা-ও- > উ-রূপে উচ্চারিত হয়—

বোন > বুন, বনে > বুনে, খোকা > খুকা, দোকান > দুকান, রোগা > (গা।

ঔ > হয় ঐ — নৌকা > লৈকা

এ > অ্যা — তেল > ত্যাল, বেল > ব্যাল, তেতুল > ত্যাতোল।

বাগড়ীতে পদের অন্তস্বর অনেক সময় প-ুত হয়—

তোখে বাগুণ আন্তে বুল্হেছি আনিস নি ক্যানে এএএএ। কতি গেল্ছিলা—অ্যা, অ্যা।

ন > ল হয়— নারকোল > লারকোল, নৌকা > লৌকা, নূতন > লুতন।

বেলডাঙ্গার বৈরগাছি এলাকায় স-ধ্বনির বাহুল্য শ্রুত হয়—খাইসু, পাইসু শব্দের মধ্যে/অন্তে ঘটে-হ-এর আগম

চিনি > চিন্হি, অনেক > অন্হেক, কুজা > কুজ্হা

ট > ড হয় — এটা > এডা, সেটা > সেডা।

বাগড়ীর ত্রি(য়াপদের মধ্যে-ল- এর আগম ঘটে

গিয়েছিল > গেল্ছিলো

ত্রি(য়ার অন্ত-চ্ছ- > ছ-এ পরিণত হয়—যাচ্ছো > যাছো, দিছো, নিছো

অপিনিহিতি এবং স্বরসঙ্গতিতে ত্রি(য়ার রূপান্তর ঘটে—যাচ্ছি > যাইছি > যেইছি > যেছি।

ইতাম-অন্তক ত্রি(য়াপদে নেতিবাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয় > তুক / তুকনা— যেতুক না, খেতুক না, করতুক না

ত্রি(য়া উচ্চারণে সং(প্ত হয় এবং মধ্যা(র লুপ্ত হয়

বলিনু > বল্নু > বন্নু, কন্নু, খানু, যানু

ছিলাম > ছিনু > ছুনু — মুই করছুনু

ছিল > ছল — ওয়া বুল্যাছল

মুর্শিদাবাদের কথ্য ত্রি(য়ার পু(ষভেদে বিপর্যয় চিহ্নি(ত করা যায়—

আমি খাই > আমি খায়

সে যাই > সে যায়

মুর্শিদাবাদের কথ্য ভাষায় দুটি বিশেষণের বিশিষ্ট প্রয়োগ চিহ্নি(ত করা যায়। 'কঠিন' বিশেষণের বহুল এবং ভিন্নার্থে ব্যবহার দৃষ্টে মুর্শিদাবাদ, মালদহের পুরনো অধিবাসীদের চিহ্নি(ত করা যায়। যেমন— কঠিন শীত, কঠিন দাম, কঠিন মিষ্টি (তীব্র) ভালো, খুব, পর্যাপ্ত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়—যাতা-বিশেষণ।

প্রশ্নোত্তরে এটির স্বচ্ছন্দ ব্যবহার। যেমন, কেমন খেয়েছো? উত্তর—যাতা খেয়েছি (আকণ্ঠ)। অনুরূপ—যাতা দেখলাম (অপূর্ব), যা তা শুনলাম (আশ্চর্য), যা তা গান (খুব ভাল)। বেশ কিছু গ্রাম্য শব্দ কেবল মাত্র বাগড়ী তেই শ্রুত হয়। যেমন—কুহ্যারা (তামাসা), ধিড়কান (ছিন্নভিন্ন), ঘাঁটা (পথ), ভুজ্যা (ভাজা), মালিস (মিশ্র গলানো তরকারী) প্রভৃতি।

বহুভাষাভাষী মানুষের আগমন এবং অঞ্চলবিশেষে গোষ্ঠীগত বসতিস্থাপন, মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন চাঁই জনগণ, বাগড়ীর পাঠান জনগোষ্ঠী প্রভৃতি। দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গের নানা স্থান থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগণ বিচ্ছিন্নভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বসবাস শু(করেন। বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠে বরিশাল কলোনী, বলরামপুর, মণীন্দ্রনগর ইত্যাদি এলাকায় উদ্বাস্তু জনগণের কথ্য শব্দ, ভাষারীতি অনিবার্যভাবে কথ্য বাংলায় প্রভাব ফেলেছে। আর উদ্বাস্তু জনগণের ভাষাও দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

বিহার পেজান্ট লাইফ গ্রন্থে গ্রিয়ারসন যানবাহন,হস্তশিল্পের বিপুল পরিভাষা সংগ্রহ করেছিলেন। রাখালরাজ রায়ের একটি নিবন্ধ ছাড়া মুর্শিদাবাদের আর কেউ এ সম্পর্কিত গবেষণা বা সংগ্রহ করেননি। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ রয়েছে। অনুসন্ধিৎসু গবেষকের (ে ত্রসমী(ায় উঠে আসতে পারে অনেক নতুন তথ্য, যা জেলার লোকভাষা সম্পর্কে প্রামান্য দলিল হতে পারে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহিত নানা প্রকার যানবাহন, হস্তশিল্পের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের রূপ এবং রীতির এক সমৃদ্ধ পরিভাষা ছড়িয়ে আছে। কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, জোলাদের উৎপাদন এবং ব্যবসার সঙ্গে জড়িত শব্দাদি এখনও লোকসমাজ ব্যবহার করে। ভিন্নগোষ্ঠীর মধ্যে শব্দ ব্যবহারে আছে পার্থক্য। যেমন ইসলামি মহালদার, গুড়িমগুল, নিকিরি মুসলমান, উদ্বাস্তু হালদার সবাই মৎস্যজীবি। হিন্দু তাঁতী, যুগী এবং ইসলামি জোলা, আন্সারি বস্ত্রবয়ন করে। তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত পরিভাষা আছে। হস্তশিল্পের বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

পাখমারা গোষ্ঠী নিজস্ব তৈরী আঠা কাঠিতে লাগিয়ে বা প্রাকৃতিক উপাদানে নির্মিত আঠাকাঠি একশিরে, দুশিরে যে সমস্ত পাখিধরা ফাঁদ বানাতেন, তাদের নাম এবং ফাঁদগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। এ নরগোষ্ঠী শরকাঠির ছিলা দিয়ে তাঁতের 'সানা' বানাতেন। তাও লুপ্তির পথে।

মুর্শিদাবাদের অপরাধ জগতে বহু সংকেত শব্দ ব্যবহৃত হয়। সীমান্তের চোরাচালান এক নূতন সংকেত শব্দগুচ্ছ তৈরী করেছে। অঞ্চল এবং অপরাধের (ে ত্রভেদে এর নানা ভিন্নতা পরিলি(ত হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ 'কুঠিয়ালি' নামে এক গুপ্ত ভাষা নির্মাণ করেছিলেন। এটি কেবল মাত্র ব্যবসায়ী জগতের চিঠিপত্র, হিসাবের খাতা, গু(ত্বপূর্ণ খবর, অবাঞ্ছিত তৃতীয় প(ে র উপস্থিতিতে কথা বলায় ব্যবহৃত হ'ত। দেবনাগরীর পরিবর্তে প্রাচীন 'ভূত নাগরী' লিপি এরা ব্যবহার করতেন। শব্দের ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বর (ে ত্র বিশেষে হ'ত বর্জিত। প্রসঙ্গ, ঘটনা এবং পরিবেশ স্মরণে রেখেই এ সংকেত ভাষার অর্থ নিষ্কাষিত হ'ত। এটি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়।

কান্দী এবং গণকরের পটুয়ারা এক নিজস্ব গুপ্তভাষা ব্যবহার করে। সাঙ্কেতিক ভাষা এবং শব্দ ব্যবহার করে দেহ-সাধক বাউল ফকির গোষ্ঠী। এখানে শব্দ দ্ব্যর্থবোধক, এক শব্দ দিয়ে অন্য শব্দার্থ প্রকাশ করা হয়(উল্টো, উদ্ভট রীতিতে মূল বিষয়কে আচ্ছাদিত করা হয়। বাউল ফকির গানে এ রীতিটি দেখা যায়। অনেক শব্দ মূল্যবোধযুক্ত(হয়ে ব্যবহৃত হয় সাধকদের মধ্যে, যেমন খাওয়া > সেবা, ঝোল > রস প্রভৃতি। শব্দকে একাধিক অর্থে অথবা একই শব্দকে একাধিকবার ভিন্নার্থে ব্যবহারের যমক ও (ে-যাত্মক রীতি জেলার কবিগানেও প্রসারিত হয়েছে।

মুর্শিদাবাদের হাটে-বাজারে, বিশেষতঃ পাইকারি কেনাবেচার বাজারগুলিতে ব্যবসায়ী বা মধ্যস্থ দালালেরা ত্রে(তাদের এড়িয়ে নিজেদের লাভালাভ, বস্তুর গুণাগুণ, দরদাম করে এক সাঙ্কেতিক ভাষায়। মুর্শিদাবাদে অনেকে এ ভাষার নাম দিয়েছে, 'দালালি বুলি'। এদের পরিমাপ, গণনা এবং দামের এক বিশিষ্ট পরিভাষা আছে। বস্তুর ভিন্নতার এ ভাষা ভিন্ন হয়ে যায়। নিমতলা-কাশিমবাজারের পাটের আড়তে(জেলার পশু-হাটগুলিতে দালালদের 'বুলি' শোনা যায়। পশুহাটে এক থেকে দশ সংখ্যার পরিবর্ত শব্দ হলো মিত/মির, বারিয়া, পিয়া, পুনিয়া, মোড়ে, ত(ই, ঝাল, বসু, খুটলো, তালা। তালা শ ১,০০০ বছর ১২০০০, লসু ১৬, বসুশ ৮০০, বসুহাজার ৮০০০ প্রভৃতি সংখ্যার পরিবর্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়।

লোকভাষা এবং কথ্য বাংলা চলমান নদী প্রবাহের মতো সংযোগ-বিয়োগের মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে চলে। পরিবর্তমান জগৎ ও জীবন মুর্শিদাবাদের কথ্যভাষার প্রবাহে প্রতিফলিত হয়ে বিবিধ পরিবর্তনের দীর্ঘছায়া প্রসারিত করছে।